দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রবীন্দ্রনাথ : চেতনায় ও চর্চায় লোকসংস্কৃতি — পৃঃ ২৮

সিএএ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত ভীত কেন? — পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ৬ মে, ২০২৪।। ২৩ বৈশাখ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

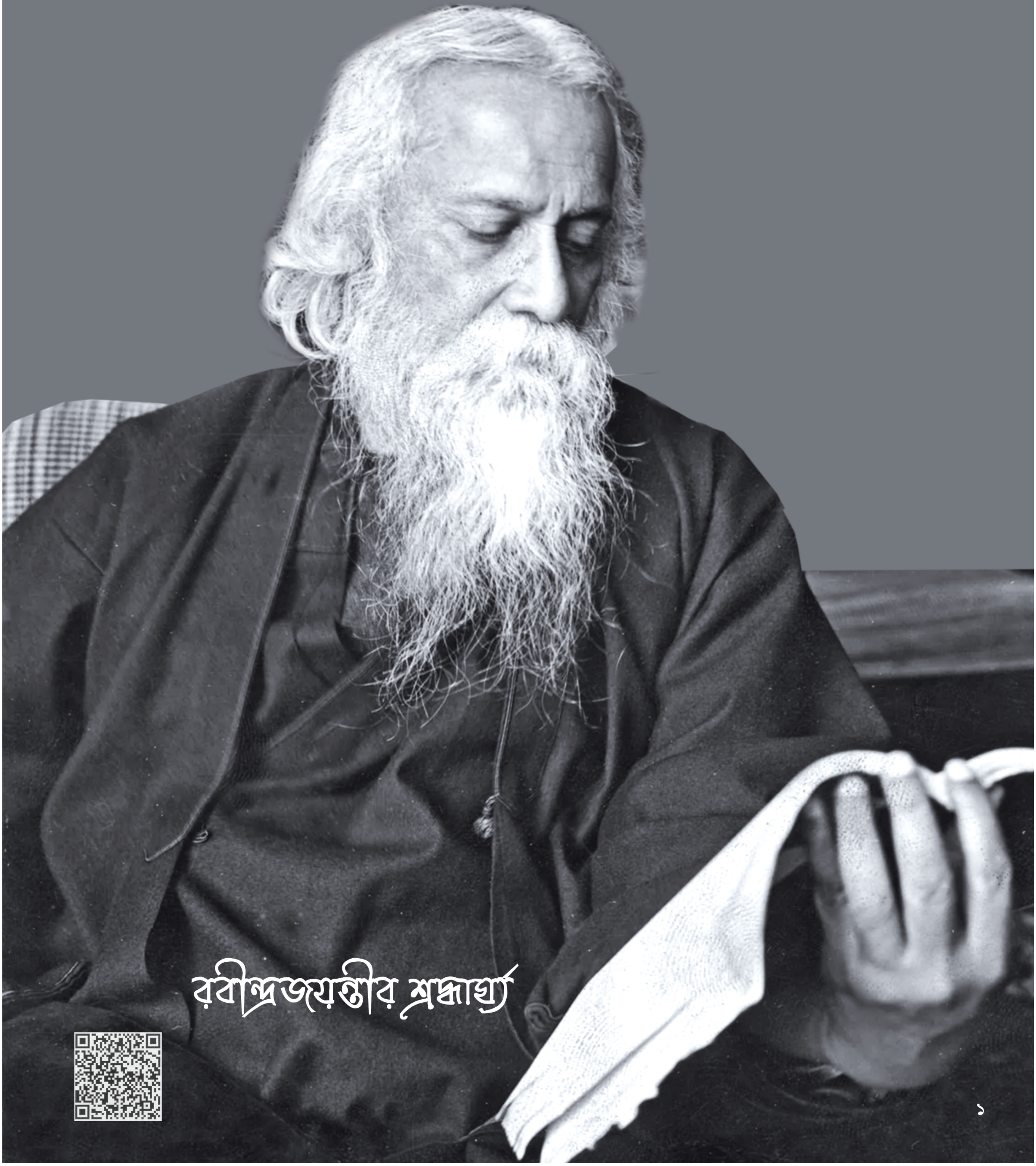

রবীন্দ্রজয়ন্তীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ।।

৭৬ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ২৩ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৬ মে - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

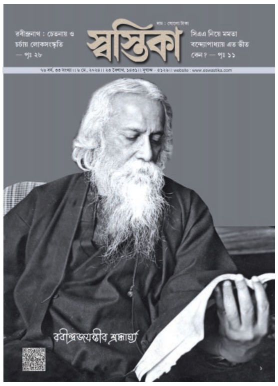

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

শাসক বাছতে ভুল বিলকুল, তাই চোরের মায়ের বড়ো গলা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির কাঠগড়ায় আদালত! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

হিন্দুত্বের চির অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ৮

সিএএ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত ভীত কেন?
◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

বিশ্বকবির দেখা পারস্য আর বর্তমান ইরানের তুলনা
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ১৩

দূর প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং আর একটি রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনা
◻ দেবজিৎ সরকার ◻ ১৭

ডাকটিকিটে রবীন্দ্রনাথ ◻ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ◻ ২৩

রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতি, পল্লী ও কৃষিউন্নয়ন
◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৪

সহজপাঠের আনন্দ এবং ফসলের চিত্রকল্প
◻ সম্বিত চৌধুরী ◻ ২৭

রবীন্দ্রনাথ : চেতনায় ও চর্চায় লোকসংস্কৃতি
◻ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ২৮

মতুয়া ধর্মান্দোলনে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা
◻ ড. সমীর চন্দ্র দাস ◻ ৩১

শুভ কাজের প্রশস্ত তিথি অক্ষয় তৃতীয়া
◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩৪

রবি রচনায় ভোজনরসিকতার পরিচয় ◻ দিতি ভট্টাচার্য্য ◻ ৩৫

সমবায় ভাবনায় রবীন্দ্র-প্রভা ◻ সঞ্জীব রায় ◻ ৪৩

২০২৪-এর ভোট লড়াই নবাব সিরাজ বনাম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
◻ রবীন্দ্রনাথ দত্ত ◻ ৪৫

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সরকারের বড়োই প্রয়োজন
◻ ড. রামানুজ গোস্বামী ◻ ৪৭

সিয়াচেনের কাছে চীনা হাইওয়ে তৈরিতে উদ্বেগে ভারত
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **খেলা : ৩৮** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০**

ফ ঃ ১

প্রকাশিত হবে ২০ মে, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২০ মে, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ কি যুদ্ধক্ষেত্র ?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দুবৃত্তায়নের সূত্রপাত কংগ্রেস আমলে। কমিউনিস্ট তথা বামেরা আমদানি করেছে সন্ত্রাসের। রাজ্যের বর্তমান শাসক দল দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাস আর দুর্নীতিকে হাতিয়ার করেই ক্ষমতায় টিকে আছে। শাসক দলের এই নির্ভরতার সুযোগ নিয়েই দুর্বৃত্ত-সন্ত্রাসীরা আজ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গকে বারুদের স্তূপে পরিণত করেছে। স্বভাবতই রাজ্যবাসী আতঙ্কিত।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালি সত্তা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত

বাঙ্গালি সত্তা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার নিকট বাঙ্গালিয়ানা ও ভারতীয়ত্ব একাকার হইয়া গিয়াছে। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলেন হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের আবহে। হিন্দু প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দু ভারতবর্ষের জাতিগত পরিণাম। তাঁহার আত্মপরিচয় প্রবন্ধে তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, যে সব পদ্ধতি যথার্থ রূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে এবং সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলময় হইয়া ওঠে, তাহাই হিন্দুধর্ম। তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে হিন্দু মেলার উল্লেখ করিয়াছেন। সনাতন ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার কাব্যে, সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশপ্রেমের কবি তিনি। ভূমার উপলব্ধির জন্য তিনি ছিলেন ব্যাকুল। উপনিষদের ঋষিগণের সহিত তিনি একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে তাঁহার ভারতবোধের স্ফুরণ ঘটিয়াছে। তিনি স্বদেশ প্রেমেরও কবি। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার স্বদেশ গীতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা জোগাইয়াছে। দেশকে তিনি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বিশ্ব চেতনায় ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট দেশ শুধু মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত নহে, মনুষ্য দ্বারা নির্মিত। দেশমাতৃকা মৃন্ময়ী নহে, চিন্ময়ী। তাঁহার অয়ি ভুবনমনোমোহিনী গানে ভারতবর্ষের জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতির ধ্যান মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রচিত তাঁহার স্বদেশ সংগীতগুলিতে মাতৃভূমির প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও মমতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার উপন্যাস, নাটক এবং ছোটো গল্পগুলিতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকেই প্রতিফলিত করিয়াছে। গোরার মুখে তিনি দিয়াছেন--'যা কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া।' স্বাদেশিকতাকে তীব্র করিবার জন্য তিনি বীরপূজা ও শিবাজী উৎসবের প্রচলন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস নির্মাণ তাঁহার ভাবনায় ছিল। বিদেশিদের দ্বারা লিখিত ইতিহাসকে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস তিনি করিয়াছেন। সর্বপ্রকার শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়নের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কটাক্ষ করিয়া তিনি সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছেন।

ভারতাত্মার সন্ধান করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জাতীয় নেতৃবর্গকে গৌরবময় অতীত ভারতের আলোকে বর্তমান ভারত নির্মাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বাঙ্গসুন্দর ভারতের রোল মডেল তাঁহার শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে তিনি স্থাপন করিয়াছেন পল্লীউন্নয়ন সংগঠন কেন্দ্র। যাহার উদ্দেশ্য হইল দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিবার সর্বপ্রকার প্রয়াস। তিনি গ্রামীণ উন্নয়নকে দেশের উন্নতির উপায় মনে করিতেন। কৃষকদের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন কৃষি সমবায় ব্যাংক। বঙ্গদেশে জলকষ্ট নিবারণকল্পে সরকারি মন্তব্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন 'স্বদেশী সমাজ'। তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ সমাজ-প্রধান দেশ, রাজশক্তি-প্রধান দেশ নহে। পাশ্চাত্যে রাজশক্তি বিপর্যস্ত হইলে দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। আর ভারতবর্ষে সমাজ যদি পঙ্গু হয় তাহা হইলে যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। স্বাধীন ভারতের রাজশক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী সমাজের মর্মার্থ অনুধাবন না করিয়া যেইভাবে দান খয়রাতির রাজনীতি করিয়া চলিয়াছে, তাহা ভারতীয় সমাজকে পঙ্গু করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের সাংস্কৃতিক দূত রূপে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ১৮৭৮ হইতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের জীবনোপলব্ধি ও দর্শনের মর্মবাণী বিশ্ব মানবের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁর ঋষিসত্তা অনুভব করিয়াছিল, ভারতীয় সত্যের মূল হইল বিশ্বমৈত্রী– বসুধৈব কুটুম্বকম্। তাঁহার গীতবিতানের ভারততীর্থ কবিতা বিশ্বমৈত্রীর এক চিরকালীন আবেদন। আনন্দের বিষয় হইল, বর্তমান ভারতও বসুধৈব কুটুম্বকম্ ধ্যেয়বাক্যকে সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বমৈত্রীর লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছে এবং বহুলাংশে সফলতা অর্জন করিয়াছে।

সুভাষিতম্

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।। *(মহাভারত, বনপর্ব)*

জীব প্রতিদিন যমালয়ে গমন করছে, এটা জেনেও অবশিষ্টরা নিজেদের স্থায়ী মনে করছে। এর থেকে আর বড়ো আশ্চর্যের কী আছে?

শাসক বাছতে ভুল বিলকুল তাই চোরের মায়ের বড়ো গলা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

প্রায় পঁচিশ হাজার চাকরি চুরির চোর চিহ্নিত হয়েছে। চোরেদের মা গলা ফুলিয়ে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কারণ তিনি নিজেই তাতে যুক্ত। মায়ের কথায় চোরেরা চাকরি চুরি আর বিক্রি করেছে। মায়ের দাবি, এ বিষয়ে তিনি অজ্ঞান। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হয়েছে। তাতে মা, সন্তান দু'জনেই ফাঁসবে। এই কেলেঙ্কারির শেষ অংশে থাকা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও জড়িয়ে যাবেন। আড়ালে তাঁকে 'বোকা ব্রাত্য' বলে ডাকা হয়।

জার্মান ভাষায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন শব্দের অর্থ মুক্তমনাদের দুর্গ। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া লেখিকা মেরী শেলী ১৮১৮ সালে এক দানব চরিত্রের সৃষ্টি করেন। মনোবিদদের ধারণা সেটা তাঁর দুঃস্বপ্নের রূপ বা সমসাময়িক সামাজিক চিত্র। দানবের স্রষ্টার নাম ভিকটর। শেলী নয় ভিকটর তৈরি করেছিলে সেই দানবকে।

২০১১ সালে বামপন্থী ড্রাকুলাদের সরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আমদানি করেন রাজ্যের মানুষ। বোঝেননি শেলীর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের চেয়ে কতটা বেশি সাঙ্ঘাতিক। শেলীর আধুনিক প্রমিথিউস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। এ রাজ্যের ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দোষ ঢাকতে অন্যকে আক্রমণ করে। কুৎসা করে বাঁচতে চায়। গলা ফাটিয়ে চুরির যথার্থতা তৈরি করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। জন্ম-মৃত্যু রহস্য, নতুন প্রজাতি তৈরি আর পুনর্জীবনের ব্যাখ্যা দেয় ভিকটরের ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। মনুষ্য নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় তা ধ্বংস হয়।

২০১১-র পরেও দু'বার মমতাকে বেছেছিলেন রাজ্যের মানুষ। খেসারত এখন তাদের দিতে হচ্ছে। মানুষ শীঘ্রই সে ভুল শুধরে নেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভূত দেখছেন! অনেকে বলছেন ভূতের নাম বিজেপি। আমি জানি তা বিজেপি নয়, দুর্নীতি। তবে বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় ভোট সমীক্ষা বলছে বিজেপি 'চমকপ্রদ' ফল করতে চলেছে।

আর তাতেই মমতাকে ভূত তাড়াবার নেশা পেয়ে বসেছে। ফল বেরোলে ৪ জুন সে ভূত শরীর নেবে। ১৭৬ বছর আগে ইউরোপে এক কমিউনিস্ট ভূত জন্মাতে গিয়ে একটি হাঁসজারু জন্মায়। তেরো বছর আগে সেই ভূত এ রাজ্যের ঘাড় থেকে নেমে যায়। মনে হয় মমতাকে মারণ ভূতে তাড়া করেছে। আদালত থেকে পরিবার সর্বত্র তিনি সেই ভূত দেখছেন আর বিজেপিকে দুষছেন। মমতা নিজেই তাকে আমদানি করেছেন। এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের নাম দিদির দুর্নীতি। সৃষ্টিকর্তা মমতা। জীবনীতে মমতা ইঙ্গিত করেছেন ভূতে বিশ্বাস করেন। তবে যে ভূত মমতা এখন দেখছেন তার সঙ্গে তাঁর জীবনীতে লেখা ভূতের কোনো মিল নেই। জীবনীর ভূত দেখে মমতা ভয় পেতেন কি

> **মমতা শেষ প্রহরের প্রমাদ গুনছেন। তাই লোকে বলছে 'চোরের মায়ের আবার বড়ো গলা'। এরপরেও যদি মমতা ম্যাজিক কাজ করে রাজ্যের মানুষ হয়ে উঠবে এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সহজ শিকার!**

না জানাননি। তবে যে ভূত এখন তাঁকে তাড়া করেছে তার আতঙ্কে মমতা সিঁটিয়ে গিয়েছেন। হয়তো বুঝেছেন পালাবার পথ নেই। রাজনৈতিক যম পিছু নিয়েছে। তার হাতেই হয়তো মমতার পতন। অনেকের দাবি মমতা রাজনৈতিক ম্যাজিক জানেন। মনে হয় এবার ম্যাজিক ফেল করবে। তাই ভূতের হাত থেকে রেহাই পেতে মরিয়া মমতা।

আদালত থেকে পরিবার পর্যন্ত সর্বত্র সেই ভূত মমতাকে তাড়া করছে। আর তাকে ঘাড় থেকে নামাতে মমতা অসংসদীয় আর অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষা বলছেন যা কিনা তার এই ভূতের কবল থেকে মুক্তির রাস্তাকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ভয় লুকিয়ে তার হাত থেকে বাঁচতে মমতা বিজেপিকে দায়ী করছেন। ভূত সৃষ্টি করেছে মমতা আর দোষ দিচ্ছেন বিজেপিকে। মমতার ভ্রম বা মতিভ্রম নতুন নয়। রাজনীতির আঙিনায় তিনি যে ধরনের উদ্ভট দাবি করেন তাতে অনেক অপটু রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তা প্রলাপ বলে মনে করেন। তার বড়ো উদাহরণ সারা দেশে মাত্র ৪৫টি আসনে লড়ে তিনি বিজেপিকে আটকাতে চান। সারা দেশে বিজেপি ৪৪৫টি আসনে লড়ছে।

অবাস্তব কল্পনার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছেন মমতা। আগেই লিখেছি শেলীর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অন্যায় বোধের অনুতাপে আত্মহত্যা করেছিল। আর এই রাজ্যের ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে রাজনৈতিকভাবে মারতে হবে বলেই বোধহয় স্থির করে ফেলেছেন এ রাজ্যের মানুষ। তার সৃষ্টিকর্তা মানুষই হবে তার ধ্বংসের কারণ। হয়তো মমতা শেষ প্রহরের প্রমাদ গুনছেন। তাই লোকে বলছে 'চোরের মায়ের আবার বড়ো গলা'। এরপরেও যদি মমতা ম্যাজিক কাজ করে রাজ্যের মানুষ হয়ে উঠবে এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সহজ শিকার! □

দিদির কাঠগড়ায় আদালত!

একনায়িকাযু দিদি,

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। রায় দিয়েছে বাংলা। কিন্তু সেখানে এটা বলা হয়নি যে, বাংলা নিজের মেয়ের মিথ্যে কথাকে চায়। বাংলা নিজের মেয়ের মুখে প্রকাশ্যে গালিগালাজ চায় বলেনি। এমন কথাও দেয়নি যে, বাংলা নিজের মেয়ের মুখে একনায়িকার মতো ভাষা প্রয়োগে আদালতকেও কাঠগড়ায় তোলার কথাবার্তা মেনে নেবে।

দিদি, জানি প্রথমেই এইসব কথাগুলো বলে আপনার রক্তচাপ বাড়ানো ঠিক হলো না। কিন্তু গায়ে লেগেছে দিদি। পরিবারে এসে গিয়েছে চাপটা। কন্যার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখঃনিসৃত গালাগালমঞ্জরি। আপনার লেখা কবিতাঞ্জলি পড়াইনি কন্যাকে এটা যেমন ঠিক, কখনও বলিনি গালমঞ্জরিও আপনি লিখতে পারেন। কিন্তু যেসব 'খারাপ' কথা বলতে নেই বলে শাসন করি সেগুলোই ওরা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শুনে বলছে, এগুলো মোটেও খারাপ কথা নয়। উনি বললে দোষ নেই আর আমরা বললেই দোষ!

এতো গেল পারিবারিক বিষয়। সমষ্টিগত ভাবেও কতগুলি বিষয় শিশু বয়স থেকেই শিখে এসেছি। পরের প্রজন্মকে সেগুলি শেখানোই কর্তব্য। বয়স্কদের শ্রদ্ধা করার মতো আদালতকে সম্মান করার শিক্ষাটাও দিয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি আপনাকে যাঁরা আদর্শ মনে করেন তাঁরাও দিনেরাতে আদালতকে বিচ্ছিরি ভাবে অসম্মান করছে। আদালতের রায়ের সমালোচনা করাই যায় কিন্তু আদালতের সমালোচনা করা যায় না। কিন্তু আপনি তো যা খুশি বলছেন। এমনকী, আদালত বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন। আপনি ঠিক যা যা বলেছেন তা মুদ্রণও ভারতীয় আইন অনুযায়ী বেঠিক। তবুও এখানে উল্লেখ করতে হলোই। জানিয়ে রাখি, দিদির বলা কথার সারাংশ লেখা হলেও আদালতকে আক্রমণ বা অশ্রদ্ধা করার কোনও অভিপ্রায় নেই এই খোলা চিঠি লেখকের বা চিঠি প্রকাশকের।

খারাপ কথা বলা রাজনীতিতে এখন চল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সেটা ছোটোখাটো নেতারা বললে একরকম। রাজনৈতিক ব্যক্তিকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে অন্যায় হলেও মেনে নেওয়া হয়। তা বলে সরকারের দুর্নীতি আদালত ধরে ফেলেছে বলে রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত মহারথীরাও এমন অসৌজন্য দেখাবেন! আপনি ও আপনার দলের শীর্ষ নেতাদের থেকে সম্প্রতি এমন কিছু উক্তি শোনা গিয়েছে, যা কেবল আপত্তিকর নয়, গভীর উদ্বেগের কারণ। সেই উক্তির লক্ষ্য রাজ্যের উচ্চ আদালত।

> **আপনি ও আপনার দলের শীর্ষ নেতাদের থেকে সম্প্রতি এমন কিছু উক্তি শোনা গিয়েছে, যা কেবল আপত্তিকর নয়, গভীর উদ্বেগের কারণ। সেই উক্তির লক্ষ্য রাজ্যের উচ্চ আদালত।**

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার রায় দেওয়ার পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনি আদালত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার জন্য কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে আইনি ব্যবস্থা করা হবে না, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই আদালতের কাছে পেশ করা হয়েছে। একই প্রশ্ন আপনার ভাইপোকে নিয়েও। ভোটে জেতার জন্য, নিজেদের অন্যায় চাপা দেওয়ার জন্য এত নীচে নামা যায়?

আদালত অবমাননা হয়েছে কিনা তা বিচারের কাজ মহামান্য আদালতের। কিন্তু আইনি বিচারের বাইরে নৈতিকতার যে পরিসর, সেখানে এই ধরনের অসংযত ও দুর্বিনীত মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা ও তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। দিদি, আপনি বিশিষ্ট সমাজের মেরুদণ্ড কিনে রেখেছেন বলে তাঁরা এখন আর এ সবে মুখ খোলেন না। কিন্তু মনে রাখবেন, শুধু সভ্যতা বা সৌজন্যের জন্য নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রেও এটা বিপজ্জনক। যে মূল স্তম্ভগুলির উপর গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে থাকে, বিচারব্যবস্থা তাদের অন্যতম। আপনি সংবিধান, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, সংসদ, প্রধানমন্ত্রী কাউকে অপমান করতে ছাড়েননি। সংবাদমাধ্যমকে পোষ্য বানিয়েছেন। এবার আদালতকেও ছাড় দিলেন না। রাজনৈতিক সুবিধা হয়তো আপনার এতে মিলবে। কিছু মানুষকে এটা বোঝানো যাবে যে চাকরি গিয়েছে বিজেপির জন্য, আমাদের দোষে নয়। কিন্তু বাকি যাঁরা বিশ্বাস করলেন না তাঁদের কাছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায় নামল একবার ভেবে দেখবেন। কী শেখালেন আপনার প্রিয় 'যুব' সমাজকে? □

হিন্দুত্বের চির অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

সালটা ১৯৮৯-৯০ হবে। পশ্চিমবঙ্গে তখন জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে চলছে বামফ্রন্ট সরকার। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী। দেশে উঠেছে রামজন্মভূমি আন্দোলনের জোয়ার। সারা দেশের সঙ্গে এই পশ্চিমবঙ্গেও আছড়ে পড়েছে তার ঢেউ। বামমনস্ক বাঙ্গালি তখন সবে আড়মোড়া ভেঙে ধর্মহীনতা ছেড়ে ধীরে ধীরে হিন্দুত্বের শিকড়ে ফিরতে শুরু করেছে। আজন্ম 'মন্দবুদ্ধি পক্ককেশ' বুদ্ধবাবু সেদিন দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার আকাশে সিঁদুরে মেঘ। অতপর শুরু হলো শয়তানি খেলা। হিন্দুত্বকে কাউন্টার করতে অনেক ভেবেচিন্তে সামনে আনা হলো বাঙ্গালির চিরকালীন শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু রবীন্দ্রনাথকে। লড়িয়ে দেওয়া হলো— হিন্দুত্ব বনাম রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা-সহ রাজ্যের বড়ো বড়ো শহরের মোড়ে মোড়ে লাগানো হলো বিশালাকার হোর্ডিং। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের বিপুল সৃষ্টিসম্ভার থেকে খামচে আনা হলো 'ধর্ম মোহ' নামে কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি— 'ধর্মের বেশে মোহ এসে যাবে ধরে/অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে,... ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো, এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো'। নীচে লেখা— তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সেদিন বামপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতার লাইনগুলি দিয়ে হিন্দু বাঙ্গালিকে বোঝাতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আসলে হিন্দুধর্ম বিরোধী। একদা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া, পুঁজিপতিদের দালাল বলে অপমান করা বামপন্থীরা সেদিন 'চাপে পড়ে বাপ্ বলে' তাঁরই উদ্ধৃতি দিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুর জনজাগরণকে কাউন্টার করার চেষ্টা করেছিল। যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম, হিন্দু দর্শন, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা,

উপনিষদের বাণীকে সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর গীতি-কাব্য-কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করে বাঙ্গালিকে হিন্দুত্বের পাঠ পড়িয়েছিলেন, বামপন্থীরা সেদিন সেই রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু বিরোধী বলে প্রচার করেছিল। আর সেই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বাঙ্গালিও রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুধর্ম বিরোধী বলে ভাবতে শুরু করেছিল।

সে ছিল একটা যুগ। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সেই হিন্দু-বাঙ্গালিবিদ্বেষী কমিউনিস্টরা আজ মহাশূন্যে বিলীন। হিন্দুধর্মকে পদে পদে অপমান করার ফল তারা পেয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যারা এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় এল তারাও হিন্দুত্ববাদীদের ঠেকাতে সেই একই নোংরা খেলায় নেমেছে। তাদের সঙ্গী হয়েছে সরকারি অন্নে পালিত পোষিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। এরা সকলে মিলে মুসলমান ভোটের লোভে হিন্দুধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি, হিন্দুত্বকে নিরন্তর অপমান করে চলেছে। সেই 'ধূর্তবুদ্ধি পক্ককেশ' বুদ্ধবাবুর স্টাইলে এরা রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। কথায় কথায় 'এ রবীন্দ্রনাথের বাংলা, এই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের কোনো স্থান নেই'— এইসব উদ্ভট কথা বলে হিন্দু বাঙ্গালিকে আবার বিভ্রান্ত করার খেলায় মেতেছে। কিন্তু তারা একবারও খুঁজে দেখল না হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন বা কী লিখেছেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৮টি খণ্ড (বিশ্বভারতী প্রকাশন) হয়তো তারা আজও খুলে দেখেননি যেখানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর দার্শনিক মতামত জানিয়েছেন। এরা যদি রবীন্দ্রনাথকে একবার পড়তেন তবে বুঝতেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে চরম হিন্দুত্বপ্রেমী। রবীন্দ্রনাথের থেকে হিন্দুত্বকে আলাদা করার অর্থ দুধ থেকে জলকে পৃথক করা, যা বস্তুত অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে প্রৌঢ়াবস্থা— জীবনের সমগ্র অংশই ছিল ভারতের সনাতনধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ।

তখন ইংরেজ শাসন। রবীন্দ্রনাথের বয়স সবেমাত্র ছয়। ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল, প্রতিষ্ঠা হলো হিন্দু মেলা। শিক্ষিত বাঙ্গালির মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা, আর নবগোপাল মিত্রের সক্রিয় প্রচেষ্টায় রূপ পেল এই হিন্দু মেলা। ঠাকুর বাড়ির উদ্যোগে এই মেলার শুরু। রবীন্দ্রনাথ এই মেলা সম্বন্ধে বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম। হিন্দু মেলায় দেশের স্তবগান, দেশানুরাগের কবিতা, দেশীয় শিল্প ও ব্যায়াম প্রদর্শিত ও গুণীজন সমাদৃত হইতেন।' ১৮৭৭ সালে হিন্দু মেলার একাদশ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি পড়েছিলেন সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— 'হারে হতভাগ্য ভারত ভূমি/কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার/পরিবারে আজি করি অলংকার/ গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে? ...যে গায় গাক, আমরা গাবো না/আমরা গাব না হরষ গান/এসো গো আমরা যে কজন আছি/আমরা ধরিব আরেক তান।' রবীন্দ্রনাথ যদি হিন্দুত্বের অনুরাগী না হতেন তবে কি তিনি এই হিন্দু মেলায় যোগদান করতেন, না স্বরচিত কবিতা পড়তেন?

১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম নিজের সুরে— যাতে বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশকে মা দুর্গা, মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বদেশ ও হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে তিনি কি গাইতেন— 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী?'

উপাসনাপদ্ধতি যাইহোক না কেন, ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকলের পরিচয়ই 'হিন্দু'। এই মতামত রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে। জাতীয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ এদেশে হিন্দুত্বই। তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দু কেবলমাত্র একটি ধর্ম নয়, একটি সংস্কৃতি, একটি জীবন দর্শন। তিনি বলেছেন, 'মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর-মন-হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদ-নদী, অরণ্য, পর্বতের মধ্য দিয়া ও বাহিরের ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।...যেমন করিয়া হোক আমাদের হিন্দু সমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয়ই যে বহু সহস্র বৎসরে হিন্দু জাতি যে অটল আশ্রয় বহু বড়ো ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার স্থানে নতুন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কিনা, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কীরূপ নির্ভর দিতে পারিবে তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে আমাদের যাহা আছে নিশ্চিন্ত মনে তাহার বিনাশ দশা দেখিতে পারিব না। (রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা-৪২)

কিছুদিন আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেছিলেন ভারতবর্ষের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু, সে যে কোনো উপাসনা পদ্ধতিরই হোক না কেন। সেসময় দেশের অনেক জ্ঞানীগুণীজন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল— মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ এরা হিন্দু হবে কী করে? এই বক্তব্যের মাধ্যমে সঙ্ঘ মুসলমান ও খ্রিস্টান-সহ বাকি সম্প্রদায়কে অপমান করছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্য নতুন কথা নয়। আজও বিদেশিদের চোখে এদেশে মানুষ হিন্দু নামেই পরিচিত। কারণ এদেশের নাম হিন্দুস্থান। তাই হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিসেবে সকলে হিন্দুই। মহম্মদ করিম চাগলা, স্যার মির্জা ইসমাইল, সৈয়দ মুজতবা আলি, মৌলভি রেজাউল করিম— সম্প্রদায়গত ভাবে নিজেদের ইসলাম মতাবলম্বী বলে পরিচয় দিলেও সাংস্কৃতিকভাবে তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন। খ্রিস্টান মতালম্বী বিপ্লবী পি. মিত্র, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাংস্কৃতিক পরিচয়ে নিজেদের হিন্দু বলেই চিহ্নিত করতেন। রবীন্দ্রনাথও ভারতবাসীকে হিন্দু বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এদেশের মুসলমান খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এমনকী নাস্তিক সম্প্রদায়কেও বলতেন— হিন্দু- মুসলমান, হিন্দু-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, হিন্দু-জৈন, হিন্দু-শিখ, হিন্দু- নাস্তিক প্রভৃতি নামে।

বলেছেন, 'তবে কি মুসলমান অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয় পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু ইহা সত্য যে কালিচরণ বাঁড়ুজ্জেমশাই হিন্দু-খ্রিস্টান ছিলেন, তাহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু-খ্রিস্টান ছিলেন, তাহার পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-খ্রিস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রিস্টান। খ্রিস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নয়, হিন্দু নয় শুনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয় বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম। কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের জাতিগত পরিণাম। (ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৪)

কি রবীন্দ্রনাথকে কেমন যেন সঙ্ঘ-সঙ্ঘ লাগছে না? আসলে সেকুলারদের চোখে রাজনৈতিক চশমা রয়েছে, তাই তারা দেখতে পাচ্ছে না যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবধারা এক। যে ভারতীয়ত্ব বোধের ভাবধারায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একশো বছর ধরে কাজ করে চলেছে, সে ভারতীয়ত্ববোধের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও দিকনির্দেশক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। তিনি উপাসনা পদ্ধতিতে ব্রাহ্ম ছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ। কিন্তু তিনি যে হিন্দু একথা বারে বারে গর্বের সঙ্গে বলতেন। বলেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দু সমাজের ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দু সমাজের একটি সার্বজনীন বিকাশ'। (ঐ, পৃষ্ঠা ১৭২)

বর্তমান যুগে সস্তা আধুনিকতার মোহে আমরা হিন্দুরা আমাদের নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতিকে আজ ভুলতে বসেছি। অনেকেই এখন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন— আমি হিন্দু নই, আমি মানুষ। অবশ্য কোনো মুসলমান বা খ্রিস্টান একথা বলে না। কেবলমাত্র হিন্দুরাই বলে আমি মানুষ, আমার কোনো ধর্ম নেই। কিন্তু আজ থেকে বহু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয় প্রবন্ধে বলেছেন, 'বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা যে কি সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা আর কিছু নই, আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নতুন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশি দূর যায় না। আমি হয়তো গতকাল ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটি নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই? এরূপ কখনো সম্ভব হইতে পারে না। অতীতের লোপ করিয়া দি এমন সাধ্যই আমার নাই। সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না। অতএব অমি হিন্দু একথা বলিতে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণও থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আদালতের জজ পাইব কোথায়?'

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সময় অনেক হিন্দু পণ্ডিত, জ্ঞানী গুণীজন নিজেদের হিন্দু পরিচয়

ভুলে যাওয়াকে এর সমাধান বলে মনে করতেন। আজও সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। আজও তথাকথিত সেকুলারবাদীরা হিন্দু-মুসলমান মিলনের মোহে 'আমি হিন্দু নই, আমি হিন্দু নই' একথা প্রায়শই বলে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-এর তীব্র বিরোধী ছিলেন। বলেছেন, 'হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা যে অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায়, তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সফলতা পাওয়া যায় না। কারণ 'হিন্দু নই' বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। কেবল আমিই তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি' (ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৭)। তাঁর মতে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও অহিন্দুর আক্রমণ হতে তার নিস্তার নেই। বরং তাঁর মতে এর একমাত্র সমাধান হিন্দুত্বের ধ্বংস নয়, হিন্দুকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা। আর এ হলো যুগের প্রয়োজন। বলেছেন, 'এক্ষণে যিনি জড়িভূত হিন্দু জাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোকস্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমানকালের মহাপুরুষ।'

স্বামীজী বলেছিলেন ভারতবর্ষের আত্মা হলো ধর্ম। এই দেশের প্রাণভোমরা আছে হিন্দুধর্মে। রবীন্দ্রনাথও এই মত ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়ত্ব। বলেছেন, ''যেমন করিয়া হউক আমাদের হিন্দু সমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসরে হিন্দু জাতি যে অটল আশ্রয়ে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠবে কিনা, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কীরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্ত মনে তাহার বিনাশ দশা দেখিতে পারিব না।" ১৯৯৫ সালে 'হিন্দুত্ব' মামলায় সুপ্রিম কোর্টও এই কথার প্রতিধ্বনি করেছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার রায়ে বলেছিল--- ''হিন্দু এদেশের একটি জীবন দর্শন। হিন্দুত্ব হলো এদেশের হাজার হাজার বছরের প্রবহমান সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিণাম।

হাজার বছরের ইসলামি শাসনের আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উঠে এদেশে আবার হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তিনি হিন্দু কুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজী। ১৬৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। নিয়েছিলেন, 'হিন্দু পদ পাদশাহী' উপাধি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে গতি আনতে বালগঙ্গাধর তিলক সারা ভারতবর্ষে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। সেকুলাররা শুনলে অবাক হবেন, ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার টাউন হলে পালন করেছিলেন সেই শিবাজী উৎসব। মহারাষ্ট্র থেকে আমন্ত্রিত করে এনেছিলেন তিলককে। সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন নিজের লেখা 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। যে কবিতার প্রধান উপজীব্য ছিল— ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা হবে এক 'ধর্ম রাজ্য'। তিনি লিখেছেন, 'সেদিন শুনিনি কথা/আজ মোরা তোমার আদেশ শির পাতি লবো/কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে মিলিবে সর্ব দেশ, ধ্যান মন্ত্রে তব/ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন/দরিদ্রের বল/এক ধর্মরাজ্য হবে এভাবে/এ মহাবনে করিব সম্বল।' রবীন্দ্রনাথকে কেমন যেন ঘোর সাম্প্রদায়িক মনে হচ্ছে না? ভারতবর্ষ ধর্মরাজ্য হবে? গৈরিক পতাকার ছত্রছায়ায় আসবে সারা দেশ? এ রবীন্দ্রনাথকে তো এতদিন বাঙ্গালি চেনেনি। এখানেই শেষ নয়। তিনি ওই কবিতাতেই লিখছেন, 'এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'— আজকালকার সেকুলাররা এ কবিতা শুনলে বলবেন রবীন্দ্রনাথ হয় চরম সাম্প্রদায়িক ছিলেন, নয়তো সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন। না, তিনি এর কোনোটাই ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে না জানা, আর তার সঙ্গে মিথ্যা প্রচার— রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালির থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মকে এ দেশের আইডেন্টিটি বলে মনে করতেন, সে রবীন্দ্রনাথ এতদিন বাঙ্গালির কাছে অজানাই ছিলেন।

যে রবীন্দ্রনাথের শিশুছড়া 'রামের বনবাস' দিয়ে অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফোটে, যে রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারী ইসলামি শাসনে বান্দা বৈরাগীর অমর কাহিনি 'বন্দি বীর' কবিতায় লেখেন 'পঞ্চ নদীর তীরে/বেণী পাকাইয়া শিরে/দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ/নির্মম নির্ভীক' যে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধমতের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেন 'পূজারিণী', যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন— ঘৃণ্য রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে সেই রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালি এতদিন ভুলেছিল। যে রবীন্দ্রনাথ ভগবান রামচন্দ্রকে নিয়ে লেখেন তাঁর অপূর্ব স্তুতিগাথা তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতায়।

সেই রবীন্দ্রনাথ কি কখনও হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী হতে পারেন? যিনি লেখেন 'ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান/নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ', তিনি কি ধর্মহীন হতে পারেন? না, কখনোই না, বরং এই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকাবাহী, হিন্দুরাষ্ট্রের বক্তা, হিন্দুত্বের চির অগ্রদূত। ☐

শোকসংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজের সূচনালগ্ন থেকে একনিষ্ঠ কার্যকর্ত্রী, সেবিকাদের কাছে মাতৃসমা রেবেকা মিত্র গত ২৭ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। সমিতির সেবিকাদের কাছে তিনি 'মায়াদি' নামে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি সমিতির প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য ছিলেন। বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্বে থাকার সময় তাঁর প্রচেষ্টায় বঙ্গপ্রান্তে সমিতির সাহিত্য সম্ভার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, তিনি প্রয়াত স্বয়ংসেবক অসীম মিত্রের সহধর্মিণী ছিলেন।

সিএএ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত ভীত কেন?

সাধন কুমার পাল

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি হলো মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় নাগরিক। 'যদি তারা নাগরিক না হন তাহলে এতদিন নির্বাচনে কীভাবে তারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে এসেছে? এই অবস্থায় তাদের আবার নাগরিকত্ব কীভাবে দেওয়া হবে?' প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

বাংলাদেশ থেকে আসা মতুয়ারা ভারতের নাগরিক নন এ কথা কিন্তু কেউ বলেনি। এটা মমতার মনগড়া কথা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তারা বারবার অভয় দিচ্ছেন সিএএ-র মাধ্যমে আবেদন করলে কারও জমি, বাড়ি, চাকরি কোনো কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং তিনি নাগরিকত্ব পাবেন। আপনি বলছেন যে তাদের যদি এখন নাগরিকত্ব নিতে হয় তাহলে এতদিন তারা কি করে ভোট দিয়েছে? তাদের ভোটে সরকার তৈরি হয়েছে, দেশ চলেছে। তাহলে কি সবই অবৈধ? এই প্রশ্নগুলো কিন্তু মমতা রাখছেন সর্বত্র। এবার শোনা যাক বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দুটি ঘটনা।

আগে কেমন করে গ্রামে জমি কেনা-বেচা হতো সবাই জানেন। আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি কেনা-বেচার সময় সঙ্গে সঙ্গে অফিসে গিয়ে আইন সঙ্গতভাবে রেজিস্ট্রি হতো না। গ্রামবাসীকে সাক্ষী রেখে জমির যা মূল্য সেই টাকাপয়সার লেন-দেন হয়ে যেত, যিনি ক্রেতা তিনি সেই জমি ভোগ দখল করতেন। আইন সঙ্গত রেজিস্ট্রি হোক না হোক ওই ক্রেতাই যে সেই জমি মালিক এটা সবার কাছেই স্বীকৃত বিষয় হয়ে যেত। এমনও দেখা গেছে জমি কেনার ৪০ বছর পর রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে সেই জমি রেজিস্ট্রি হচ্ছে। মমতা সিএএ নিয়ে যেসব প্রশ্ন করছেন সেই রকম প্রশ্ন করলে বলতে হবে জমি তো ভোগ দখল করেই খাচ্ছেন তাহলে তাঁর জমি রেজিস্ট্রি করার দরকারটা কী।

জনজাতি সমাজের মধ্যে দেখা যায় অনেক পরিবার যারা স্বামী স্ত্রী হিসেবে বসবাস করছেন কোনো আইন সঙ্গত বা সামাজিক বিয়ে না করেই। তাদের বাচ্চাকাচ্চাও হচ্ছে। আসলে ওরা এত দরিদ্র যে অর্থের অভাবে সামাজিকভাবে বিয়েটা করতে পারেনি। ফলে প্রকৃত বিয়ের ২৫-৩০ বছর পরে বাচ্চাকাচ্চা বড়ো হয়ে গেলেও ওরা সামাজিকভাবে নিজেরা বিয়ে করে। দেশের প্রচুর এনজিও জনজাতি সমাজের গণবিবাহের মাধ্যমে এই সামাজিক কাজে সহায়তা করে থাকে। মমতার মতো প্রশ্ন করলে বলতে হবে ওরা তো একসঙ্গে ঘর সংসার করছেই, বাচ্চাকাচ্চাও হয়ে গেছে, তাহলে আর বিয়ের দরকারটা কী? মমতার তোলা প্রশ্নটাও কিন্তু এই ধরনের। আসলে ভারতবর্ষ দেশটাও কিন্তু মমতার মতো শাসকরা সেই গ্রামের জমি কেনা-বেচার মতো করেই কিংবা দুঃস্থ জনজাতিদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই চালিয়েছেন।

> **মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এই চ্যালেঞ্জ রাখা যায় যে মেঠো ভাষণ দিয়ে মানুষকে ভয় না দেখিয়ে পারলে আইন-আদালতের মাধ্যমে সিএএ-কে ঠেকিয়ে দেখান।**

ভোটমুখী সস্তার রাজনীতিবিদরা কখনোই ভাবেননি যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছেন তাদের আইনসঙ্গতভাবে নাগরিকত্ব দিতে হবে। দেশভাগের সময় গান্ধীজী এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুঃ একাধিকবার বলেছেন দেশভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা ভারতে এলে চিরকাল আশ্রয় পাবে এবং ভারত তাদের নাগরিকত্ব দেবে। কিন্তু তারা তাদের কথা রাখেননি, তাদের উত্তরসূরী শাসকরাও সেকথা রাখেননি। তারা সবকিছু ভুলে গিয়ে দেশভাগকালীন সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন। ১৯৭১ সালে অল্প সময়ের জন্য এরকম নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষমতা মহকুমা শাসকদেরও দেওয়া হয়েছিল। সেসময় অনেকেই এরকম নাগরিকত্ব নিয়েছেন, তারা বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন রকম ভাবে সরকারি কাগজপত্র তৈরি করে নিয়েছেন। মমতাও কেন্দ্রে বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় ছিলেন, দীর্ঘদিন রাজনীতি করছেন। এই সমস্যাটার দিকে তিনি আলোকপাত করেননি কেন?

এই সিএএ আইন আরও বহু আগেই পাশ হওয়া উচিত ছিল। তাহলে এই দেশকে দারুল ইসলামে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত অনুপ্রবেশকারীরা মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে এই দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তন করতে পারতো না। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড-সহ বিএসএফের হাতে ধরা পড়া প্রত্যেকটি বাংলাদেশির, পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীর পকেটেও আধার কার্ড, ভোটার কার্ড আছে। তার মানে কি তারা ভারতের নাগরিক? মমতার পুলিশ তাদের ধরছে কেন? দয়া করে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেবেন?

মনে রাখতে হবে, এটা কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটা সংসদে পাশ হওয়া

ফঃ ২

আইন। এজন্য সিএএ শুধু মতুয়াদের জন্যই নয়, ভারতে বসবাসকারী সমস্ত শরণার্থীদেরও নাগরিকত্বের পথ প্রশস্ত করবে। এটি নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে সভা থেকে মতুয়া সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন--- 'এখানে আবেদন করলে আপনারা নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও বে-নাগরিক হয়ে যাবেন। অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন'। মুখ্যমন্ত্রী দয়া করে বলবেন যে সিএএ আইনের কোন ধারা অনুসারে আবেদনকারী বেনাগরিক হয়ে যাবেন। মুখে বললে হবে না আইনের ধারা তুলে বলতে হবে।

২০১৯ সালে যখন এই আইন পার্লামেন্টে পাশ হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গ ও অসম এই দুই রাজ্যেই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছিল। অসমের প্রেক্ষাপটটা আলাদা ছিল এবং সেটাও এখন অনেকটাই বদল হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, 'সিএএ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে আবার ভাগ করার এবং দেশ থেকে বাঙ্গালিদের বিতাড়িত করার খেলা।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে বাঙ্গালি ও বাংলাদেশি মুসলমান এই বিষয়টি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা হচ্ছে তাঁর সবচাইতে বিশ্বস্ত ভোটব্যাংক। সেজন্যই তিনি 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছেন, বাংলাদেশের স্লোগান 'খেলা হবে' নিজের পার্টি স্লোগানে পরিণত করেছেন। এটা হতে দেওয়া যায় না, বাঙ্গালি ও বাংলাদেশি মুসলমান এক হতে পারে না। দেশভাগের পর এবং বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরও বাংলাদেশি মুসলমানরা সিংহভাগ হিন্দু বাঙ্গালিদের তাদের চোদ্দপুরুষের ভিটে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মানুষগুলো আশ্রয় নেওয়ার পর তৃণমূলের হার্মাদরা তাদের থেকে টাকা তুলছে। অভিযোগ, পুলিশও তাদের থেকে টাকা তুলছে। তারা প্রতিদিন ব্ল্যাকমেলের স্বীকার হচ্ছে। চড়া দাম দিয়ে তারা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছেন রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তৃণমূলের বহু তোলাবাজি ও দুর্নীতির কথা মানুষ জেনেছে। কিন্তু শরণার্থী হিন্দুদের ব্ল্যাকমেল করে টাকা তোলা কিন্তু এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের ব্ল্যাকমেলিং করে টাকা তোলাও তৃণমূলিদের একটা আয়ের বড়ো উৎস। সিএএ-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেয়ে গেলে এদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। হতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্যই এত বিরোধিতা করছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখানে যদি সিএএ এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর (এনআরসি) মাধ্যমে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না। এই আইনটা আসলে একটি প্রতারণা।' দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় পালটা দাবি জানিয়ে বলেছে, এই আইন নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার নয়, বরং নাগরিকত্ব দেওয়ার পক্ষে। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দাবি যে মমতার দাবির চাইতে অনেক বেশি সত্য একথা পশ্চিমবঙ্গের একটি শিশুও জানে। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী কাল্পনিক আন্দোলনের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোট বাক্স ভর্তি করার পরিকল্পনা করছেন। মনে হয় না সেটা সফল হবে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার একটি সভা থেকে এই আইনের সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'সিএএ হলো এনআরসি-র সঙ্গে যুক্ত। বিজেপি এখানে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে চাইছে। তাই আবেদন করার আগে একবার নয়, হাজারবার ভাবুন। একটা মানুষেরও অধিকার কেড়ে নিতে দেব না।' মুখ্যমন্ত্রী কি প্রমাণ করতে পারবেন সিএএ এনআরসির সঙ্গে যুক্ত? তিনি অসমের এনআরসি দিয়ে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন? অসমের এনআরসি প্রক্রিয়া তো শুরু হয়েছিল সেই কংগ্রেসের আমলে। সেজন্য অসমের এনআরসি নিয়ে দুর্ভোগের দায় মমতাকেও দিতে হবে। সে সময় কংগ্রেসের ছেড়ে যাওয়া জুতোতে পা ঢুকিয়ে বিজেপি সাময়িক ভুল করেছিল। সংবাদমাধ্যমে খবর আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদেরই নয় ভারতে যেখানেই এরকম বাঙ্গালি আছে তাদের কাছেও মমতার ভিডিয়ো যাচ্ছে। তাদের ভয় দেখাতে তিনি সফল নন, কারণ ব্যক্তিগতভাবে ভিন রাজ্যের অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে মমতার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ভিন রাজ্যের শরণার্থীরা ব্যপক হারে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করছেন।

শুধু অসম কেন, পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলিতেও প্রচুর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে যারা বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে, পরে তাদের স্থান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জেলে। এগুলো কি ডিটেনশন ক্যাম্প নয়? মমতার দেওয়া তথ্য অনুসারে অসমে নাকি ১৪ লক্ষ মানুষ এরকম ডিটেনশন ক্যাম্পে আছে। এটা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন? ১৪ লক্ষ কেন অসমে ১ জন হিন্দু বাঙ্গালি ডিটেনশন ক্যাম্পে আছেন, এটা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন? যদি না পারেন তাহলে তিনি কি পদত্যাগ করবেন? হাতে মাইক থাকলে, পুলিশি ঘেরাটোপে দাঁড়িয়ে এরকম অনেক আজেবাজে কথা বলা যায়। যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিন করছেন।

অসমে যাদের নাম এনআরসিতে নেই এমন হিন্দুর সঙ্গেও কথা বলে দেখা গেছে যে তাদের বক্তব্য— এনআরসিতে নাম না থাকার জন্য হয়তো কোনো টেকনিক্যাল কারণ রয়েছে। কিন্তু এনআরসিটা খুব প্রয়োজন। তারা এর জন্য এতটুকু ভয় ভীত নন। ভবিষ্যতে আবার যখন প্রক্রিয়া চালু হবে তাদের নাম ঠিক উঠে যাবে, তাদের কাউকে কোথাও যেতে হবে না।

আসলে সুশাসন কায়েম হলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। নাগরিকত্বের প্রশ্ন নিয়ে কোনোরকম দ্বন্দ্ব থাকলে কখনোই সুশাসন কায়েম হতে পারে না। ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র নয়। সিএএ প্রণয়ন করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই গ্রামীণ জমি কেনা-বেচার মতো সরকার চালানোর প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এটা সবদিক থেকেই সুলক্ষণ। সেজন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রান্ত প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে যাদের প্রয়োজন তাদের অবশ্যই নির্ভয়ে সিএএ-র মাধ্যমে আবেদন করে নাগরিকত্ব নেওয়া উচিত। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এই চ্যালেঞ্জ রাখা যায় যে মেঠো ভাষণ দিয়ে মানুষকে ভয় না দেখিয়ে পারলে আইন-আদালতের মাধ্যমে সিএএ-কে ঠেকিয়ে দেখান। ◻

বাগদাদে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবির দেখা পারস্য আর বর্তমান ইরানের তুলনা

পিন্টু সান্যাল

১৮৭৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ৫৬ বছরের সময়কালে বিশ্বকবির বিশ্ব ভ্রমণে ৩২টিরও বেশি দেশে তার চরণ স্পর্শ করেছিল। বিভিন্ন বয়সে উদ্দেশ্য বিভিন্ন থাকলেও তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি যেমন জানা যায় বর্তমান কালের প্রেক্ষিতে তার তুলনাও করা যায়। যিনি নিজেকে বিশ্বমানবের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতেন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার রূপান্তরের মাধ্যমে মানব মুক্তির পথকে বুঝতে, সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে তিনি যে বারবার বেরিয়ে পড়বেন তা স্বাভাবিক।

১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর বিভিন্ন দেশ থেকে ডাক আসে সংবর্ধনা গ্রহণের। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিশ্বভারতী নামে শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব ও ভারতের যে মিলনক্ষেত্র তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় এবং বিশ্বের গণ্যমান্য শিক্ষাবিদ্‌দের শান্তিনিকেতনে আনার সুযোগ হয়েছিল এই ক্লান্তিহীন ভ্রমণগুলির মাধ্যমে।

১৯৩২ সালে সত্তরোর্ধ্ব কবি ইরানের শাসক রেজা শাহ পহেলভির আমন্ত্রণে শুশ্রূষার প্রয়োজনে বউমা প্রতিমাদেবী এবং কর্মসহায়করূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ১১ এপ্রিল দমদম বিমানবন্দর থেকে ব্যোমতরীতে যাত্রা শুরু করেন। ১৩ এপ্রিলে সকাল সাড়ে-আটটার সময় বুশেয়ারে নামেন। ১৬ তারিখে বুশেয়ার থেকে শিরাজ তারপর ২২ তারিখে ইস্পাহান, ২৯ এপ্রিল পৌঁছান পারস্যের রাজধানী তেহরানে। ২ মে সাক্ষাৎ করেন ইরানের শাসক রেজা শাহ পহেলভির সঙ্গে।

বিশ্বকবির পারস্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান ইরানের সামাজিক ও রাষ্ট্র নৈতিক ভূমিকার তুলনা বর্তমান বিশ্বের সংকটজনক পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধ লেখার আগেই ইজরায়েলে ইরানের মিসাইল হামলার জবাবে ইজরায়েল ইরানের ইস্পাহান শহরে হামলা করেছে। ১৯৪৮ সালে বিশ্বের মানচিত্রে ইজরায়েলের আত্মপ্রকাশের পর ইরানের সঙ্গে ইজরায়েলের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক মধুর ছিল। ইজরায়েলের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরণ করতো ইরান ও ইজরায়েলের নতুন প্রযুক্তি পেত ইরান। এখন সেই ইরানের পারমাণবিক বোমার গবেষণা যে দেশটির কাছে সব থেকে বেশি বিপজ্জনক তার নাম ইজরায়েল। ১৯৩২ সালে কবিগুরুর বিশ্ব ভ্রমণের সময়কার পারস্যে আর এখনকার ইরানের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর, আর এই পার্থক্যই বিশ্ব শান্তির পথে অন্তরায়।

১৯৩২ সালে পারস্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে কবি জানাচ্ছেন, 'নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাত থেকে পারস্য যেমন বরাবর আঘাত পেয়েছে পৃথিবীতে আর কোনো দেশ এমন পায়নি, তবু তার জীবনীশক্তি বারবার নিজের পুনঃসংস্কার করেছে। বর্তমান যুগে আবার সেই কাজে সে লেগেছে, জেগে উঠেছে আপন মূর্ছিত দশা থেকে।

পারস্যের এই মূর্ছিত দশা কাজার বংশীয়

ইউরোপের মুক্তচিন্তা গ্রহণ করে রেজা শাহের আমলে মোল্লাতন্ত্র মুক্ত ও ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত যে পারস্যের সূচনা কবিগুরু দেখেছিলেন সেখানে আজ হিজাব বিরোধী আন্দোলনের গলা টিপতে নারীহত্যা করতেও দ্বিধা করে না ইরানের ইসলামিক রিপাবলিক।

রাজা আগা খাঁর দুর্বল শাসনব্যবস্থা আর অত্যাচারের জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে পারস্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কয়েকবছর আগেই ইরানে খনিজ তেলের অস্তিত্ব জানা গেছে। ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলি তখন ইরানের তৈলভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইরানে প্রথম সাংবিধানিক সভা তৈরি হয় আর সংখ্যালঘু জরাথুস্ট্রীয় উপাসনা পদ্ধতিকে প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বলশেভিক বিপ্লবের সময় কিছুকাল রাশিয়া সরে দাঁড়ালেও দ্বিতীয় দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব কাটিয়ে রেজা শাহ পহেল্ভি শক্তহাতে ইরানের হাল ধরেন। রেজা খান থেকে নিজের নামকে রেজা শাহ পহেলভি করে প্রাচীন পার্সিভাষা তথা পারসিক ইতিহাসের সঙ্গে নিজের পরিচয়কে যুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পারস্যে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''পারস্যে যে মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেছি। তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলছে আলো জানি।'' এই আলো রেজা শাহের উদারনীতির আলো, উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন হলেও কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসকে আলিঙ্গন করার আলো। কবি সে সম্পর্কে জেনেছেন 'এখানে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কীরকম ব্যবহার, এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্বকালে জরথুস্ট্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্তমান রাজার শাসনে পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে; সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্মহিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই।' রেজা শাহ বেশিরভাগ পুরুষদের মোল্লাবেশ নিষিদ্ধ করেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের বোরখা নিষিদ্ধ করেন, যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে পুরুষ- মহিলার একসঙ্গে যাওয়া নিষিদ্ধ তাদের উপর করের বোঝা বাড়িয়ে দেন। পারস্যের নাম পরিবর্তন করে 'আর্য' পরিচয়কে সামনে এনে সরকারিভাবে দেশের নাম 'ইরান' করেন যা 'আর্যান' শব্দের অপভ্রংশ। রেজা শাহের প্রতি কবিগুরুর বিশ্বাস অমূলক ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত রাশিয়া মিলে ইরান থেকে জার্মানদের বহিষ্কার করার আদেশ করলে রেজা শাহ মানতে অস্বীকার করেন। ফলে রেজা শাহকে সরতে হয়। হিটলারের হাত থেকে ইরানের তৈলভাণ্ডার রক্ষা করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়া, ইংল্যান্ড একসঙ্গে ইরানকে নিজেদের দখলে নেয়। কবিগুরু ইউরোপের বিজ্ঞানসাধনাকে সত্যের সাধনা বলেছিলেন কিন্তু সেই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে তামসিকতা বলেছিলেন। রেজা শাহ চেয়েছিলেন ইউরোপের মুক্তচিন্তাকে কিন্তু মূল্য দিয়েছিলেন ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়ার লোভের।

কবিগুরু পারস্যের যে সংস্কার দেখে আশাবাদী হয়েছিলেন তার সমাপ্তি ঘটে যখন ১৯৭৯ সালে পহেলভি বংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইরানের সর্বাধিনায়ক আয়াতোল্লা খোমেইনির নেতৃত্বে 'Islamic Republic of Iran' গঠিত হয়। সুন্নি আরব ও তুরস্ককে পিছনে ফেলে শিয়া ইরান ইসলামি দুনিয়ার নেতৃত্বে একসময়ের বন্ধু ইজরায়েলকে ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করে। এই কট্টরতা ইরানের জন্মজাত নয়, এই ইসলামিক কট্টরপন্থী ইরানের সঙ্গে ২৫০০ বছরের প্রাচীন পারস্যের কোনো মিল নেই। আজ ইরান ইজরায়েলকে ধ্বংস করতে হামাস, হিজবুল্লা, হুতি জঙ্গিগোষ্ঠীকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। কবিগুরু পারস্য ভ্রমণের সময় যে আলো দেখেছিলেন তা নিভে গেছে। কবির ভ্রমণকালের রেজা শাহ পহেলভির কাজ দেখে অভিজ্ঞতা কেবল যে বিদেশির কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েছেন তা নয়, মোল্লাদের আধিপত্যজালে দৃঢ়বদ্ধ পারস্যকে মুক্তি দিয়ে শাসনতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেছেন। বর্তমানের ইরানে মোল্লাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বকবি পারস্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় নৃশংসতার বিরুদ্ধে পারস্যের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন আর স্মৃতিচারণ করেছেন আকিমেনীয়, সাসিরীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের সঙ্গে যেনো প্রাচীন ভারতের যোগ খোঁজার চেষ্টা করেছেন, ''সমগ্র পারস্যের সেই প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরস, তাঁর প্রকৃত নাম খোরাস। তিনি শুধু যে সমস্ত পারস্যকে এক করলেন তা নয়, সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজদা। ভারতীয় বরুণদেবের সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য। বাহ্যিক প্রতিমার কাছে বাহ্যিক পূজা আহরণের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই তাঁর আরাধনা ছিল না। তিনি তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য ও সাধু কর্ম। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্যদেবতার মতোই তাঁর মন্দির ছিল না এবং এখানকার মতোই ছিল অগ্নিবেদী।''

শিরাজ থেকে ইস্ফাহানের পথে কবি দেখেন আকেমেনীয় শহর পার্সিপোলিসের ধ্বংসাবশেষ। আলেকজান্ডারের আক্রমণে আকেমেনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। কবি লিখেছেন, 'এই পর্সিপোলিসে ছিল দরিয়ুসের গ্রন্থাগার। বহু সহস্র চর্মপত্রে রুপালি সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা লিপীকৃত হয়ে এইখানে রক্ষিত ছিল। যিনি এটাকে ভস্মসাৎ করেছিলেন তাঁর ধর্ম এর কাছে বর্বরতা। আলেকজান্ডার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যাননি যা এই পর্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ স্বরূপে তুলনীয় হতে পারে। প্রসঙ্গত, আলেকজান্দ্রিয়ার যে লাইব্রেরিকে গ্রিকদের বলে দাবি করা হয় তা আসলে লুট করা দারিয়ুসের গ্রন্থাগার। কবি জানতে পারেন ''পারস্যে আর এক জায়গা খনন করে প্রাচীনতর বিস্মৃত যুগের জিনিস পাওয়া গেছে। অধ্যাপক তারই একটি নকশাকাটা ডিমের খোলার পাত্র আমাকে দেখালেন। বললেন মহেঞ্জোদরোর যেরকম কারুচিত্র এও সেই জাতের। সার অরেল্স্টাইন মধ্যএশিয়া থেকেও এমন কিছু কিছু জিনিস পেয়েছেন মহেঞ্জোদরোয় যার সাদৃশ্য মেলে। এইরকম বহুদূরবিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলি দেখে মনে হয় আধুনিক সকল সভ্যতার পূর্বে একটা বড়ো সভ্যতা পৃথিবীতে তার লীলা বিস্তার করে অন্তর্ধান করেছে।'' আর্য আক্রমণ তত্ত্বের ষড়যন্ত্র সেই সময়ে ভারতীয়দের বিভ্রান্ত না করলে কবি নিশ্চিত হতে পারতেন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পারস্যের সম্বন্ধ নিয়ে। আজ যে ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তা ব্যবসায়িক। ইরান ইসলামিক দেশ হওয়ার পর তার পতাকা থেকে আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের স্মৃতি বহনকারী সিংহ ও সূর্যের প্রতীক সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিক হওয়ার আগে ১৯৭১ সালে ইরানে পারস্য সাম্রাজ্যের ২৫০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হয়েছে। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরেও পারস্যের সাসিনীয় সাম্রাজ্য পারস্যকে আবার পুনর্গঠন করে, পুরাতন জরাথুস্ট্রীয় উপাসনা পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও ইহুদি, খ্রিস্টানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। একদিকে খ্রিস্ট্রীয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের চাপ আর অন্যদিকে আরবদের ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। পারস্য নিজের পরিচয় হারাতে শুরু করে। কিছু পার্সি ভারতের গুজরাট ও মুম্বাইতে শরণার্থী হয়ে আসে।

ইরানের শিরাজে হাফেজের পুরাতন স্মৃতিসৌধ

কবি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন পারস্যকে নিয়ে, 'আশ্চর্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে পারস্য বারবার দলিত হয়েছে, তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃপুন নিজেকে প্রকাশ করতে পারলে।'

তেহরানে ৬ মে কবির জন্মদিন পালিত হয়েছিল। সেখানে এক পার্সি ভদ্রলোকের বিশ্লেষণ—'তিনি বললেন, সমস্ত জাতিকে আশ্রয় করে পারস্যে যে ভাষা ও সাহিত্য বহমান তারই ধারাবাহিকতা পারস্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অনাবৃষ্টির রুদ্রতা যখন তাকে বাইরে থেকে পুড়িয়েছে তখন তার অন্তরের সম্বল ছিল তার আপন নদী। এতে শুধু যে পারস্যের আত্মস্বরূপকে রক্ষা করেছে তা নয়, যারা পারস্যকে মারতে এসেছিল তারাই পারস্যের কাছ থেকে নূতন প্রাণ পেলে—আরব থেকে আরম্ভ করে মোগল পর্যন্ত।'

পারস্যের উপাসনা পদ্ধতি জোর করে পরিবর্তন করা হলেও প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিচ্ছেদ্য ছিল পারসি ভাষার মাধ্যমে।

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়ে, খলিফার পার্সীয়-বৌদ্ধ বংশোদ্ভূত ওয়াজির (মন্ত্রী)-দের উদ্যোগে পার্সিয়া ও ভারতবর্ষ থেকে আনা বইগুলোর অনুবাদ শুরু হয়। এই পারসিক-বৌদ্ধ বংশোদ্ভূতদের 'বার্মাকিড' বলা হতো। রাশিদুন খিলাফতের সময়ে (৬৩৩-৬৫৪ খ্রিঃ) খলিফা উমরের (৬৫১ খ্রিঃ) নেতৃত্বে পার্সিয়ার সসিনীয় (প্রধানত জোরাস্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বী) সাম্রাজ্যের পতন হলে এই বৌদ্ধ বার্মাকরা ইসলাম গ্রহণ করে।

বিভিন্ন উৎস থেকে বই অনুবাদ করার অভ্যাস বার্মাকিডদের আগে থেকেই ছিল। পার্থক্য এইটুকুই যে সাসিনীয় সাম্রাজ্যের সময় তারা পার্সি (পাহ্লভি) ভাষায় অনুবাদ করতো আর এখন খলিফার জন্য আরবিতে অনুবাদ করছে। একদিকে বাইজান্টাইন আর অন্যদিকে খিলাফতের আক্রমণে চার শতাব্দীর (২২৪-৬৫১ খ্রিঃ) সাসিনীয় সাম্রাজ্যের পতন হলেও নতুন পার্সিয় মুসলমানদের কদর খিলাফত সাম্রাজ্যে বাড়তে থাকে।

ছোটোবেলায় আমরা সবাই নীতি শিক্ষামূলক গল্প পড়েছি বা শুনেছি যেখানে বিভিন্ন পশুপাখিকে চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এই গল্পগুলোর উৎস প্রায় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংস্কৃতে লেখা পঞ্চতন্ত্র। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলি পার্সি ভাষা থেকে আরবিতে অনূদিত হয় প্রায় ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে। এর আগে সংস্কৃত থেকে পার্সি ভাষায় অনুবাদ করা হয় ৫০০ খ্রিস্টাব্দে। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ আমাদের জ্ঞানের প্রবাহের দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়। গ্রিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয় ১০৮০ খ্রিস্ট্রাব্দে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা গেলেও পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে অস্বীকার করার উপায় নেই। এখনো ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরের দেওয়ালে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনি খোদাই করা আছে। পঞ্চতন্ত্র প্রমাণ করে যে জ্ঞানের প্রবাহ ভারত থেকে পার্সিয়া, পার্সিয়াা থেকে আরব এবং আরব থেকে খ্রিস্টীয় ইউরোপ– এই পথেই হয়েছিল। কবিগুরু যথার্থই বলেছেন---

'আরবরা, তুর্কিরা মোগলরা এসেছিল দানশূন্য হস্তে, কেবলমাত্র অস্ত্র নিয়ে। আরব পারসিকে ধর্ম দিয়েছে, কিন্তু পারস্য আরবকে দিয়েছে আপন নানা বিদ্যা ও শিল্পসম্পন্ন সভ্যতা। ইসলামকে পারস্য ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে।' পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণের পর পারস্যে যে সাফাভিদ রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের শিয়া মতকে প্রাধান্য দেয়। আজ যে সুন্নি আরব আর শিয়া ইরাকের মধ্যে মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্ব পাওয়ার লড়াই তার সূত্রপাত বলা যায়। সুন্নি অটোমান আর সুন্নি মোগলদের মাঝে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেদ্দেলা শিয়ার পারস্য। মোগলদের সরকারি ভাষা আরবি না হয়ে পার্সি হলো। অনেক ঐতিহাসিক ইন্দো-পার্সিয়ান সংস্কৃতির কথা বলেন, কিন্তু মোগলদের মাধ্যমে পার্সিয়ার যে প্রভাবের কথা বলা হয় তা আসলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পারস্যের আয়নায় প্রতিফলন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদার মোগল সম্রাট দারা শিকোর উদ্যোগে উপনিষদের পার্সি অনুবাদ ইউরোপে পৌঁছায় যা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় দর্শনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বর্তমানে সুন্নি আরবে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে,আরবের মরুভূমিতে স্বামীনারায়ণ মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে কিন্তু শিয়া ইরানের তালা বিশ্বসংস্কৃতির জন্য বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২-এর আগে

তেহরানে ইরানিয়ান মজলিসের সদস্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থনের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাগীদার করার ব্যর্থ প্রয়াস দেখেছেন। কবিকে দেশবিভাজন দেখে যেতে হয়নি কিন্তু তার কারণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

প্রত্যেক দেশে গিয়ে শৈশব থেকেই উপনিষদীয় দর্শনে সম্পৃক্ত কবি মানব মিলনের ঐক্যবিন্দু খুঁজেছেন। আবার তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজতেন।

পারস্যের আরব সীমানার কানিকিন রেলওয়ে স্টেশনের ভোজনশালায় চা খাওয়ার সময় একজন কবিকে বলেছিলেন— 'আমরা সকলেই এক। ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্মের নামে কেন যে এমন বিরোধ সৃষ্টি করছে আমরা একেবারেই বুঝতে পারিনি'। ভারতীয়েরাও বলেন, 'এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার লেশমাত্র নেই।' দেখা যাচ্ছে ঈজিপ্টে তুরস্কে ইরাকে পারস্যে সর্বত্র ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দুর সীমানায় মুসলমানের সীমানায়।" এই সীমানা যে এখনো মুছে যায় নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাবর, ঔরঙ্গজেবের কুকীর্তিকে আগলে রাখার চেষ্টায়। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মূলগত সমস্যাকে মাথায় রেখেই বাগদাদের সাহিত্য সভায় সাহিত্যিকদের কাছে কবির আবেদন— "দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে মানুষে মানুষে মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।"

কিন্তু ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েও 'অন্তরে-বাহিরে এক হতে' আর কত দেরি তার উত্তর ভবিষ্যৎ দিবে কিন্তু কবিগুরু পারস্যের যে নবোত্থান দেখেছিলেন তার সমাধি ১৯৭৯ সালে আয়াতোল্লা খোমেইনির নেতৃত্বে ইসলামি আগ্রাসনের মাধ্যমে হয়ে গেছে। রেজা শাহ পহেলভির আচরণে ক্ষুব্ধ ত্রিশক্তি অর্থাৎ আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত রাশিয়া রেজা শাহের পুত্র মহম্মদ রেজা শাহকে রাজা করে, যিনি ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন আর আমেরিকার হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের পর থেকে ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার নৈকট্য বেড়েছে। ইউরোপের মুক্তচিন্তা গ্রহণ করে রেজা শাহের আমলে মোল্লাতন্ত্র মুক্ত ও ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত যে ইরানের সূচনা কবিগুরু দেখেছিলেন সেখানে আজ হিজাব বিরোধী আন্দোলনের গলা টিপতে নারীহত্যা করতেও দ্বিধা করে না ইরানের ইসলামিক রিপাবলিক। ২২ বছরের মাহসা আমিনি, ১৬ বছরের নিকা শাকারামির মৃত্যু ইরানের পাপের বোঝা বাড়িয়েছে। ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হলেও কর্ণাটকে হিজাবের সমর্থনে আন্দোলন ভাবতে বাধ্য করে ভারতে কবিগুরুর ইঙ্গিত 'অন্তরে-বাহিরে' ঐক্যলাভের উপায় কী? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পালিয়ে আসা পার্সিদের বংশধর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, রতন টাটা যাঁরা সংখ্যালঘুদের মধ্যে লঘুতম ভারতের সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে বলিষ্ঠ করতে তাঁদের যোগদান প্রশংসনীয়। কখনো ইউরোপীয় প্রভাবে ইরানে অর্থনৈতিক লুঠ আবার কখনো কট্টরপন্থী ইসলামিক শক্তির প্রভাবে মধ্যযুগীয় সামাজিক ব্যবস্থার নৃশংসতার চাপে প্রাচীন পারস্য জাতির মানুষেরা নিজেদের ঐতিহাসিক পরিচয় থেকে, মানবাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন। ইরানের পার্লামেন্টের যে কোনো আইন শরিয়া কানুনের অনুসারী হলে তবেই তা বিশেষজ্ঞ মোল্লা কমিটির অনুমোদন পেতে পারে। যে কোনো সংস্কারপন্থী প্রতিনিধির নির্বাচনে অংশগ্রহণ আটকে দেওয়া ইরানে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। রাশিয়ার ইশারায় ইরান আমেরিকা-ইজরায়েলকে চোখ রাঙাতে ভয় পায় না। ইরান এখন শুধু পারমাণবিক বোমা বানানোর অপেক্ষায়।

কবিগুরু ১৯৩২ সালে যেখানে সংস্কারের আলো দেখেছিলেন সেখানেই এখন মানবতার বিপদসংকুল ঘন অন্ধকার। কবিগুরু জাপানের সাম্রাজ্যবাদী রূপ দেখে জাপানের আসন্ন ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তা মিলে গিয়েছিল। ইরানের ক্ষেত্রেও সে দিন হয়তো আর দূরে নেই—'বোঝা তোর ভারী হলে ডুববে তরীখান'। তরী ডুববার আগেই প্রাচীন পারস্য জাতি আবার জেগে উঠে নিজের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হলে ইরানের মঙ্গল, বিশ্বের মঙ্গল।

দূর প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং আর একটি রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চার মাসের এই দূরপ্রাচ্য ভ্রমণের সময়কালে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝের বছরগুলিতে দ্রুত ঘটে চলা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একের পর এক অধ্যায়ে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল, যা এখনও গবেষণার দাবি রাখে।

দেবজিৎ সরকার

হিন্দুসূর্যের মধ্যাহ্নের ছটা তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। সওদাগরি ময়ূরপঙ্খী অথবা ক্ষত্রিয় অশ্বখুরকে মাধ্যম করে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপরাজ্যে হিন্দুমননের নির্যাস পাথেয় করে তৈরি হচ্ছে জনপদ। হিন্দুশৌর্য শোণিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে রাজকুল। শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, জাভা, সুমাত্রা ছাড়িয়ে ভারতীয় মেধার মধু ও সনাতনী সুবাস ছড়াতে উদ্যত পলিনেশিয়ার বিপরীতে দ্বীপ-মহাদেশে। বৈদিক ভারত ও দ্বীপবাসীর আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে আর্যভূমির বিস্তার পূর্ব দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো। মূল ভূখণ্ড থেকে বয়ে চলা এই সাংস্কৃতিক বিস্তার কখনো তলোয়ার বা তিরের ডগায় হয়নি। দস্যু তস্করের লালসাকে প্রতিহত করতে তলোয়ার, তির ব্যবহৃত হয়েছিল বটে, তা কখনই সাধারণ মানুষের লুণ্ঠনের যন্ত্রে পরিণত হয়নি। কেননা ভারতভূমি থেকে যাঁরা 'কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্যম্' ঋষিবাণীকে পাথেয় করে পুবের পথে পা বাড়িয়েছিলেন তাঁদের দর্শন 'ভ্রাতরঃ মনুজা সর্বে', অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষই আমার ভাই, আমি এক অখণ্ড মানব জাতির প্রতিনিধি। রিলিজিয়নের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আমার উপাস্যকে না মানলে তোমায় খুন হতে হবে, আমার উপাস্যের পূজক না হলে তোমার সম্পত্তি লুঠ হবে, তোমার নারীর উপর অত্যাচার করার অধিকার জন্মাবে—দ্বীপরাজ্যে আঞ্চলিক জনতার কাছে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত আর্য-সন্তানেরা এরকম কোনো ঘোষণা করেননি।

ভারতবর্ষের এই মনীষার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৭ সালের ১২ জুলাই প্রাচীন ভারতের সেই সামরিক শৌর্য ও বৌদ্ধিক বৈভবকে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে মালয়, জাভা, থাইল্যান্ড ও বালিদ্বীপ ভ্রমণে গেলেন। তার বছর দশেক আগেই ঘুরে এসেছিলেন ব্রহ্মদেশ।

এই দুই ভ্রমণের মাঝে ১৯১৯-এর এপ্রিলে সংগঠিত রামনবমীর শোভাযাত্রা এবং তৎপরবর্তী ব্রিটিশ তৎপরতার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বৈশাখী উৎসব উপলক্ষ্যে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে সংগঠিত মেলায় শিশু-মহিলা নির্বিশেষে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর গণহত্যা সংগঠিত হলো। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কবি প্রতিবাদ করতে চাইলে গান্ধী নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস ও গান্ধীবিরোধী গোষ্ঠী বলে পরিচিত চিত্তরঞ্জন দাশের অনীহা এবং অপমান কবিকে শুধু ব্যথিত নয়, ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। নাইট উপাধি ত্যাগ করে কিছুটা ক্ষোভ ব্যক্ত করলেও তৎকালীন কংগ্রেসের রাজনৈতিক অপদার্থতা কবিমনকে বিকল্পের সন্ধানে নিয়োজিত করল। জাহাজে রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণ শুরু হলো ১৯২৭ সালের ১২ই জুলাই দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ থেকে। আটদিন পর ১৯ জুলাই কবিগুরু সিঙ্গাপুর পৌঁছালেন। ২৩ জুলাই সিঙ্গাপুরে তৎকালীন ব্রিটিশ সিংহলের গভর্নর স্যার হিউজ ক্লিফোর্ড, যিনি নিজেও একজন লেখক ও উপন্যাসিক ছিলেন, তাঁর সভাপতিত্বে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে 'ইউনিটি অব ম্যান' সম্বন্ধে কবি বক্তব্য রাখলেন। তারপরে কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। ২৭ জুলাই তিনি মালাস্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে সেলেঙ্গার, ক্লাং, কুয়া কাংসার, তাইসিং প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়ে কবি পেনাং থেকে যাত্রা শুরু করেন। ২৩ আগস্ট কবি বাটাভিয়ায় পৌঁছে এক নৈশভোজের অনুষ্ঠানে তাঁর রচিত 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন এবং ২৪ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর বালিদ্বীপে অবস্থান করেন।

এরপর কবি ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বিখ্যাত বরবুদুরের মন্দির দেখে বান্দুং ও বাটাভিয়ার পথে থাইল্যান্ডে পৌঁছান। সেখান থেকে জলপথে ২৭ অক্টোবর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই চার মাসের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা কবিগুরু তাঁর প্রিয়জনদের কাছে বিভিন্ন চিঠিতে বর্ণনা করেছেন যা 'জাভাযাত্রীর পত্র' হিসেবে সংকলিত হয়েছে। এই পত্রগুচ্ছে কবি ড. প্রশান্ত মহালানবিশের স্ত্রী শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহালানবিশকে লিখছেন, ''ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে।'' অর্থাৎ তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মালয়দ্বীপ প্রভৃতি দেশে যে ভারতবর্ষের জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল এবং সেইসব দেশের মানুষের সঙ্গে সত্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তার কথা লিখেছেন, ''ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি।'' কবির দেখবার ছিল, সেদিন ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিক থেকে উদ্বোধিত করেছিল। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সংগীতে, সাহিত্যে--- সর্বত্র তার চিহ্ন; মরুভূমে, অরণ্যে, পর্বতে, দ্বীপে, দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে সর্বত্র।

নির্মলকুমারীকে আরও একটি পত্রে লিখলেন, ''এখনকার পাবলিক একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্বসাধারণ। তার মধ্যে খুব

নিরেট হয়ে তাল পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরও কত কী। এই সর্বসাধারণ যে মানবসাধারণের প্রতিরূপ, তা বলা চলবে না। এর ফরমাশ যে একশো বছর পরের ফরমাশের সঙ্গে মিলবে না, সেকথা জোর করেই বলতে পারি।”

লিখলেন, “পাবলিক মহারাজ আজ দুই চোখ লাল করে যে কথাটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আসছে কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তার নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা।...” আসছে-কাল সেটাকে নিয়ে কবির এই অনুভব আজ ৯৭ বছর পর আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক।

সেখানে রাজবাড়িতে কবি ও তাঁর সহযাত্রী ভাষাবিদ সুনীতিকুমার মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রিত। রাজার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো। সুদূর প্রাচ্যে হিন্দুধর্মের বিস্তার প্রসঙ্গে ইসলামের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ নির্মল কুমারীকে লিখছেন, হিন্দুধর্ম রফানিষ্পত্তিসূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট করে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করেনি, ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য আনতে চেয়েছে।'

বালিদ্বীপে কেন হিন্দুরা পারল না, মুসলমানরা পারল তা লিখেছেন, “মুসলমানে মুসলমানে এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এইজন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশ প্রত্যংশ নিয়ে কেবলই নড়নড় করছে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে যে কেবলমাত্র আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিকভাবে আপন ধর্মের বিস্তার করে।... হিন্দু যদি তা পারত তা হলে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্মে স্থায়ী বিশুদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত হতে দেরি হতো না।”

পিনাং থেকে বাটাভিয়ায় পৌঁছে বালিদ্বীপের কারেমআসন থেকে ৩০ আগস্টের চিঠিতে কবির হৃদয় লিখল ভারতের স্বর্ণিম অতীতের পতনের সূচনার কারণ ও তার মুক্তির উপায়, “জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে, যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়......বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারিদিকে যে প্রভূত আবর্জনার অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণপথে চলে, এগোয় না, কেবলই ঘোরে।”

কীভাবে হিন্দুধর্ম দূরপ্রাচ্যে ক্রমবিলীয়মান হয়েছে তার কারণ খুঁজে কবি লিখলেন, “এক সময়ে এরা সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম পেয়েছিল, ...তার পরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে—হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হলো নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কষে বাঁধলো, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল এ কথা সে ভুললো।” তাই তো ওদেশে পথে-ঘাটে পদে-পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান। তা সংস্কার হতে পায়নি বলে কালের হাতে সেইসব অভিজ্ঞান কিছু ক্ষয়ে গেছে, বেঁকেচুরে কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে।

কবি লিখলেন, ভারতবর্ষ আত্মমূর্তিধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্বমহাসাগরের সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন করে স্থান পেয়েছিল যে হাজার বছর পরেও সেই ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, “সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে, ব্যাপ্ত করবার জন্যে, কীরকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে---যে দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।”

অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠিতে জানা যায় বালির হিন্দুরা নিজের ধর্মকে 'আগম' বলে। তবে কি হিন্দুধর্মের অন্যতম সাধনমার্গ তন্ত্র বিষ্ণুক্রান্তার অধিক্ষেত্র সেই সুদূর প্রাচ্যেও তার জায়গা খুঁজে নিয়েছিল? অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন, ২ অক্টোবর সুদূরপূর্ব থেকে আক্ষেপ করছেন ভ্রমণের সময়কালটি কবির জন্য খুবই স্বল্প। “আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়। ....এই লয় তো আমাদের জীবনের অভ্যস্ত লয় নয়, তাই বাইরের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে চালাতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়তে হয়। যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য বলেই মনে হয় না তেমনি হুড়মুড় করে কাজ করাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করা যায় না।” বললেন, “মৌমাছিকে ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে কেবল যদি উড়তেই হয়, ফুলের উপর একটুমাত্র পা ছুঁইয়েই তখনই যদি সে ছিটকে পড়ে, তা হলে তার ঘুরে বেড়ানোটা যেমন ব্যর্থ হয়, আমার মনও তেমনি ব্যর্থতার দমকা হাওয়ায় ভন্‌ভন্‌ করেই ম'লে।”

কবির এই ভ্রমণকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এই দূর প্রাচ্যেই ডানা মেলেছিল। সুদূর পাঞ্জাব থেকে গদর পার্টির কাজ এই এলাকায় তখন ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯১২ তে রাসবিহারী বসু দিল্লিতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ছুঁড়ে জাপানে আত্মগোপন করে থাকলেও শ্যামদেশের গদর পার্টির একটি অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ' স্থাপন করেন। ভারতে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, যাঁর পূর্বাশ্রমে নাম প্রফুল্ল কুমার সেন, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃততে এম.এ, পরে সন্ন্যাসী, তাঁকে প্রতিনিধি হিসেবে থাইল্যান্ডে পাঠালেন। তিনি 'ধর্মআশ্রম' নামে একটি আশ্রম ও 'ভয়েস অফ দি ইস্ট' নামে একটি পত্রিকা চালাতে লাগলেন। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে মিলিত করা এবং সুভাষকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে একক নেতৃত্বের স্বীকৃতিদানের বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতে সত্যানন্দ এক জাপানি সামরিক বিমানে টোকিয়োর উদ্দেশে রওনা দেন। ঠিক তার দুদিন পরে জাপান সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় বিমানটি জাপান সাগরের কাছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে সত্যানন্দ পুরী মারা যান। রহস্যে মোড়া ওই বিমান দুর্ঘটনা এবং সত্যানন্দ পুরীর মৃত্যু (?) দূরপ্রাচ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় হয়তো রবীন্দ্র অবদানে যবনিকা টানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চার মাসের এই দূরপ্রাচ্য ভ্রমণের সময়কালে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝের বছরগুলিতে দ্রুত ঘটে চলা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একের পর এক অধ্যায়ে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল, যা এখনও গবেষণার দাবি রাখে। আশা রাখি, ভবিষ্যতের গবেষণা সে বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য জানাবে। □

জাস্টিস দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ সঠিক এবং সময়োচিত

শীতে গরম গরম চা চাই। গরমে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জল চাই। সময়ের পট পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের চাওয়া-পাওয়া পরিবর্তন হয়। আগে তৃণমূল বলতো খেলা হবে। এখন বিজেপি বলছে খেলা দেখাবো। সময়ের পরিবর্তনে কেউ খেলা করে, কেউ খেলা দেখে। গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে নির্বাচনী মহারণ। নির্বাচন নামক যুদ্ধ টানা এক মাস ধরে চলবে। হার-জিৎ আছে। সরকার যাবে, সরকার আসবে। এই নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। বিজেপি বিরোধী প্রধান দল কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর হাত ধরে অপরিণত থেকে গেছে। তাদের গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে। সিপিএমের দেশ বিরোধী কার্যকলাপে মদত দিয়ে এখন তারা কার্যত জনগণের নাগালের বাইরে। তৃণমূল নেত্রী হাজার হাজার কেলেঙ্কারির খল নায়িকা। কাজে নড়বড়ে, নাটুকেপনা, শুধু শ্রী শ্রী থেকে কুশ্রী-মিথ্যাশ্রীতে ভরপুর। প্রতিটা জনগণ সুন্দর, শান্তির জীবনের ছবি আঁকে। এই সরকার পরিবর্তন হলে তাদের মুক্তি মিলবে, কাজ মিলবে, নৈরাজ্য দূর হবে এমনটাই তারা ভাবে।

অন্যদিকে নেতারা ক্ষমতা হাতে পেলে টাকা চুরি করবে এমন স্বপ্ন দেখে। আইন ভেঙে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। নীতি, নৈতিকতার ধার ধারে না। চুরিই তাদের ধ্যান-জ্ঞান প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এ গণতন্ত্র জনগণের নয়, নেতাদের গণতন্ত্র। তারা ম্যান মেইড নেতা নয়, তারা ফ্যামিলি মেইড নেতা। তাই তারা নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কেউই তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না, এমনকী কোর্ট নয় এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আইন ভাঙতে মরিয়া হয়ে ওঠে। দীর্ঘ লাল সন্ত্রাস থেকে নীল-সাদার সন্ত্রাস আরও বেড়ে যায়, আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। টেট দুর্নীতি থেকে কয়লা কেলেঙ্কারি গোরু পাচার, কয়লা পাচার, সোনা পাচার, টাকা পাচার প্রভৃতি হাজার দুর্নীতি রাজ্য সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

লোকসভা নির্বাচনের শুরুতে ২০১৬-র আপার প্রাইমারির প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। সমস্ত বেতনের সুদ-সহ ১২ শতাংশ টাকা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য সবাই নয়। অযোগ্যদের ফেরত দিতে হবে।

তবে এখানো যোগ্য অযোগ্য বাছা খুব কঠিন কাজ। টেট পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি, ও.এম.আর শিট ছাড়া চাকরি-প্যানেলের মেয়াদের শেষে চাকরি সব কেমন হজপজ ব্যাপার। এমনকী মাধ্যমিক পাশ, অষ্টম শ্রেণী পাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছে। মেরিট লিস্ট নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নেই। টাকা দিয়ে ফোন ম্যাসেজে চাকরি। কখনো লেন-দেন ঘাটতি হলে ফোনে চাকরি বাতিল। এখানে নিয়মের কোনো তোয়াক্কা নেই। হাইকোর্ট তাই এমন কঠোর আদেশ দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় রয়েছে। জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলী থেকে জাস্টিস দেবাংশু বসাকের রায়ে ঘুষ দেওয়া শিক্ষক ছাড়া সবাই খুশি। রাজ্য সরকার নির্বাচনের দোহাই দিয়ে বাতিল শিক্ষকদের দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া করে নিতে চায়। সরকারের মাথাব্যথা জনগণের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে না। আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলে জনগণ বিচার পায়। এমন দ্রুত রায় দান সঠিক এবং সময়োচিত। অন্যান্য দুর্নীতির যেমন মেডিক্যাল থেকে বিসিএস সব দুর্নীতির তদন্ত হোক। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে আসুক এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা পাক।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

অপরাধীদের শাস্তি চাই

একজন মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র যোগ্যতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। কিছু লোভী মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য আজ কিছু শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অপমানিত, প্রতারিত ও সমাজের চোখে নিন্দিত হচ্ছে। শিক্ষকতা কেবল চাকরি নয়, এটা একটি মহৎ ব্রত ও পেশা। সেই মহৎ ব্রত ও পেশা আজ রাজনীতির দাবা খেলায় ভূলুণ্ঠিত। দায়ী কে? বা কারা? সেই অপরাধীদের শাস্তি চাই। যদি মন্ত্রীসভার অনুমোদনে এই দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে এই মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হোক। আর সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্বৃত্ত পরায়ণ রাজ্য সরকারকেও বরখাস্ত করা হোক। মন্ত্রীসভার সহযোগিতাতে যখন এতো বড়ো দুর্নীতি হচ্ছে তার দায় সম্পূর্ণ মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। তাঁকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। এবিআরএসএম মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের বহিষ্কারের দাবি জানায়।

—**অনুপম বেরা,**
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক
এবিআরএসএম, পশ্চিমবঙ্গ (উচ্চ শিক্ষা)।

পশ্চিমবঙ্গে অপশাসনের অবসান হোক

গণতান্ত্রিক দেশের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যম হলো ভোট। এককথায় ভোট হলো গণতন্ত্রের বড়ো উৎসব। আমাদের দেশে তিন ধরনের নির্বাচন হয়। লোকসভা, বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই তিন ধরনের নির্বাচনের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামবাঙ্গলার মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে তারা তাদের এলাকায় জনগণের সুখ-দুঃখের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। আসলে ভোট হলো পছন্দের গ্রহণযোগ্য

ফ ঃ ৩

কাজের ও কাছের মানুষকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া। আমাদের দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক দল মিলিয়ে কয়েকশো রাজনৈতিক দল আছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোটের ময়দানে নামাতে পারে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে যে কোনো ভারতীয় নাগরিক জনগণের স্বার্থে নিজেও ভোটে দাঁড়াতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দিনে দিনে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিকভাবে এখানে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে জনগণের সেবার বদলে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

তাই ভোট এলেই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেতা, মন্ত্রী সবাই সর্বদা ব্যস্ত। এমনকী গ্রামে ঘরে কর্মীদের মধ্যে খুন, ধর্ষণ করতে ইন্ধন দেন। গুলি, বন্দুক, বোমা সবকিছু নিয়ে ভোটের ময়দানে নেমে পড়েন। বিগত দু' দশক ধরে রাজ্যে একটা অপশাসনের সরকার চলছে। জনগণের পরিষেবার কথা কেবলমাত্র ভোট এলেই তাদের মনে পড়ে আর তখন সব পক্ষকেই শুধু প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা যায়। বিগত পঞ্চায়েত ভোট গ্রামবাঙ্গলার মানুষের পছন্দের ও আপদে বিপদে পাশে থাকার গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি খোঁজার ভোট ছিল। তিন ধরনের ভোটের মধ্যে এই ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গ্রামবাঙ্গলার মানুষের উন্নয়নের জন্য এবং তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য ১৯৭৮ সাল থেকে এই পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা চালু হয়। লোকসভা, বিধানসভার প্রতিনিধিকে গ্রামের মানুষ সবসময় কাছে পায় না। কিন্তু পঞ্চায়েত, প্রধানেরা গ্রামের মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এই পঞ্চায়েত ভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয়নি। যাতে রাজ্যের জনগণ তাদের কাছের ও কাজের মানুষকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারেন। কিন্তু এরাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, যে দল সরকারে থাকে সেই দল গ্রামবাঙ্গলার দখল নিতে চায়।

ক্ষমতাসীন সরকার পুলিশ, প্রশাসন ও বন্দুকবাহিনী দিয়ে ভোটের দিন গণতন্ত্রকে হত্যা করে এবং জনগণের মত প্রকাশে বাধা দেয়। বুথ দখল, ছাপ্পা দিয়ে মানুষের রায়কে পালটে দেওয়া হয়। ফলে শাসকের পছন্দের প্রার্থীকেই জনগণ মেনে নিতে বাধ্য হয়, তাই সাধারণ মানুষের বর্তমানে ভোটের প্রতি উৎসাহ বেশি নেই। যদি লুটের রাজত্বে চোর, ডাকাত, সমাজবিরোধী সাধারণ মানুষের পছন্দের বাইরে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, তারা মানুষ ও সমাজের পক্ষে কাজ কীভাবে করবে? বাঙ্গালি এখন নোংরা রাজনীতির কাদা গায়ে মাখতে চায় না। চোখের সামনে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি হলেও নিরাপত্তাহীনতায় কোনো প্রতিবাদ করার সাহস করে না। সবাই জানে রাজনীতি একটা ব্যবসা আর নেতা, মন্ত্রীরা কামানোর জন্য ভোটের ময়দানে আসেন। তাই সাধারণ মানুষের কাছে দান, ভাতার মূল্য বেশি। তারা মনে করে সারাবছর কিছু হলেও তো পাচ্ছি। তাই তারা দুর্নীতি, বেকারত্বের বিরুদ্ধে ভোট দেয় না। তারা জানে না একশো দিনের কাজের টাকার হিসেব রাজ্য ঠিকমতো পেশ করে না। তারা জানে কেন্দ্র অনৈতিক ভাবে টাকা আটকে রেখেছে। আর বর্তমানে প্রধান বিরোধীদল গ্রামে ঘরের মানুষের কাছে সেইভাবে পৌঁছাতে পারেনি।

কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ টাকায় নাম পালটে রাজ্য সরকার কীভাবে প্রকল্পগুলি চালাচ্ছে এটাও জনসাধারণের কাছে সেইভাবে পৌঁছাতে পারেনি। তাই নাম পালটে রাজ্য সরকার কীভাবে প্রকল্পগুলি চালাচ্ছে এটাও জনসাধারণের কাছে সেইভাবে পৌঁছাতে পারেনি। তাই শাসকদল এতো দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতির পরেও পঞ্চায়েত গুলি আবার দখল করেছে।

এতোদিন বিরোধী হিসেবে বিজেপির নেতাকর্মীদের গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়াতে সেইভাবে দেখা যায়নি। বরং কোথাও কোথাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে চলেছে। তাই এবারের পঞ্চায়েত ভোটে গ্রামবাঙ্গলার মানুষের ভোট ভাগ হয়েছিল। এতে বেশি লাভ হয়েছে শাসকদলের। বিজেপি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ও সেরকম গ্রহণযোগ্য মুখ তুলে আনেননি। বরং রাম, শ্যাম, যদু, মধু যাকে পেয়েছে তাকেই পঞ্চায়েতে প্রার্থী করেছিল। রাজ্যের মানুষ একটা গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য দল হিসেবে বিজেপি-কেই চায় কিন্তু গ্রামের দিকে যারা দলের নেতৃত্বে আছেন তারা জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তারা নির্ভরযোগ্য বিকল্প শক্তি পাচ্ছেন না। এবার সিপিএম আবার জনগণের কাছে যেতে শুরু করেছে। গ্রামের মানুষের কাছে তাদের ভুল স্বীকার করে পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছে। তাই এবারের পঞ্চায়েত ভোটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ রায় বোধহয় দেয়নি। কিন্তু লোকসভায় এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল সরকার গঠনের জন্য গোটা দেশের মানুষ ভোট দেবেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘোরাটোপে এবারের নির্বাচন হচ্ছে, ফলে রাজ্যের মানুষ তাদের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে ভোট দিতে পারছেন। দেশে শক্তিশালী সরকার গঠন হলে এবং পশ্চিমবঙ্গে কুড়িটির বেশি আসন পেলে রাজ্যের মানুষ এই অপশাসনের হাত থেকে শীঘ্রই রক্ষা পাবে।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিমমেদিনীপুর।

একশো আট সংখ্যা শুভ কেন?

হিন্দু ধর্মে ১০৮ সংখ্যার নিজস্ব মাহাত্ম্য রয়েছে। রুদ্রাক্ষের মালায় ১০৮টি রুদ্রাক্ষ রয়েছে। ১০৮ বার মন্ত্র জপ করা হয়। আবার ১০৮ বার ঈশ্বরের নাম নিলে শুভ ফল লাভ করা যায়। শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে এই সংখ্যার গুরুত্ব রয়েছে।

এবার মূল বিষয়ে আসা যাক। মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট ২৭টি নক্ষত্রের কথা মনে রাখতে হবে। এই নক্ষত্রগুলো ১০৮ পাদে বিভক্ত। প্রতিটি ৯ পাদ এক একটি আকৃতি গঠন করে। পর পর ১২টি আকৃতি হচ্ছে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুলি এক একটি রাশি ও মাসের নাম। ১২ মাসে এক বছর পূর্ণ হয়। এক বছর পূর্ণ হওয়া মানে উল্লিখিত ১০৮ পাদ পূর্ণ হওয়া। অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যকে একবার পরিক্রমা পূর্ণ করে। এই সূত্রে ১০৮ পূর্ণতাসূচক হওয়ায় সংখ্যাটি শুভ। উল্লেখ্য, সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়। তাই সাতও পূর্ণতাসূচক এবং শুভ সংখ্যা।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,** কালিয়াগঞ্জ।

পণপ্রথা বন্ধ করার উপায়

ড. অপর্ণা দে

নারীবিরোধী কুপ্রথা বহুদিন ধরে সমাজে প্রচলিত। এমন অনেক কুরীতি একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও সমান্তরাল ভাবে বিরাজমান। বহু মনীষীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু কুপ্রথা অবলুপ্ত হলেও পণপ্রথা আজও জগদ্দল পাথরের মতো সমাজের বুকে চেপে রয়েছে। আজও দেশের কোনো না কোনো গৃহবধূ পণের জন্য নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। আজও বহু শিক্ষিত যুবক নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে 'পণ' প্রাপ্তির নিরিখে। বিয়ের প্রয়োজনীয়তা শুধু মেয়েদেরই রয়েছে তা নয়, পুরুষদেরও সমানভাবে রয়েছে। তাহলে শুধু মেয়েদের ওপরই বিয়ের মূল্যের বোঝা বহনের দায়িত্ব কেন থাকবে– একথা যুক্তি দিয়ে বিচার করার সময় এসেছে। দেশের যুব সমাজ বিশেষত যুবতীদের এর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে নিয়ে পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

পণপ্রথা আজও সমাজে প্রকট ভাবে প্রচলিত থাকার কারণগুলি হলো ঃ (১) মেয়েদের প্রতি সমাজের হীন মনোভাব ও অবহেলা। কন্যাসন্তানকে অধিকাংশ মা-বাবা বোঝা স্বরূপ মনে করেন। (২) আত্মমর্যাদাহীন পুরুষদের শ্রমবিমুখতা। বহু আত্মমর্যাদাহীন যুবক বিনা পরিশ্রমে বিলাসবহুল জীবনযাপনে আগ্রহী। তারা নিজের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে বিলাসদ্রব্য ক্রয় না করে বিয়ের পণ স্বরূপ টাকা ও জিনিসপত্রের দাবি করে বসে। (৩) কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা। (৪) মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধের অভাব। (৫) আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের পরনির্ভরতা। (৬) বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য। (৭) সামর্থ্যবান অভিভাবকদের কন্যার বিয়ের সময় উপহারের নামে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান। (৮) সামর্থ্যহীন অভিভাবকদের কন্যার জন্য ধনী পাত্র লাভের বাসনা। (৯) মেয়েদের সম্পত্তিহীনতা। ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের আগে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমঅধিকার নিশ্চিত ছিল না। বর্তমান আইনে সমঅধিকার ঘোষিত হলেও এর প্রয়োগ তেমন ভাবে হচ্ছে না।

পণপ্রথা বন্ধ করার উপায় ঃ (১) মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা, সে যেন আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের ও পরিবারের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। (২) মেয়েদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা, যেন সে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে সক্ষম হয়। (৩) পরিবারে ও সমাজে মেয়েদের ভূমিকার ও অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া। (৪) ছেলে ও মেয়ে উভয়কে ছোটোবেলা থেকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মবিশ্বসী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। (৫) পণ নেওয়া যে ভিক্ষা চাওয়ার সমান এই বোধ ছেলেদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। (৬) পণ নেওয়া ও দেওয়া দুটোকেই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে সমাজের সবাইকে। (৭) পিতা-মাতার জীবিতকালে মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা। (৮) সামাজিক কুসংস্কার ও কুশিক্ষা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে দূর করা।

পণপ্রথার সামাজিক প্রভাব ঃ (১) মেয়েদের মর্যাদার, ভূমিকার ও অবদানের অবমূল্যায়ন। (২) বিবাহ ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ। (৩) সামাজিক অবক্ষয়। (৪) সামাজিক ভারসাম্যের অবনমন। (৫) মহিলাদের বিরুদ্ধে পারিবারিক হিংসা বৃদ্ধি। (৬) পণের দাবিদার পাত্রের সঙ্গে নিরুপায় কন্যাটি বিয়ে করতে বাধ্য হলেও স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মায় না। এতে পরিবারের ভিত দুর্বল হয়। (৭) যুবকদের শ্রমবিমুখতা বৃদ্ধি পায়। (৮) কন্যাসন্তানের প্রতি অনীহা ও কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। (৯) মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার অভাব দেখা দেয়।

পণপ্রথা দূরীকরণে নারীশিক্ষার ভূমিকা ঃ শিক্ষা জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখায়। আত্মনির্ভরশীল করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতা গড়ে তোলে। নিজেকে চিনতে শেখায়। ভালো-মন্দের, উচিত-অনৌচিত্যের বোধ জাগ্রত করে। স্বনির্ভর করে।

পণপ্রথা বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আজকের যুবসমাজ বিশেষ করে যুবকদের পণপ্রথা বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হবে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে পণ নেওয়ার জন্য চাপ এলেও যুবকদের দৃঢ়তার সঙ্গে বোঝাতে হবে যে, কন্যাটি পণের বিনিময়ে বিয়ে করতে রাজি হলেও স্বামী বা পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা না জন্মে ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা জন্মাবে।

সুন্দর দাম্পত্যজীবনের জন্য প্রয়োজন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। পরস্পরের প্রতি এই অনুভূতিগুলি তৈরি না হলে সুখী দাম্পত্যজীবন সম্ভব নয়। তাই পণপথা বন্ধ করতে সকলকে এই কুপ্রথা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং নিজেদের জীবন থেকে এই ব্যাধি দূর করতে হবে। তবেই হয়তো পরবর্তী প্রজন্মকে পণপ্রথার অভিশাপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। ■

শান্তির ঘুম

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ডিনারে যদি দেদার মাছ, মাংস, ডিম খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে সেটি ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় শান্তিতে ঘুমের স্বার্থে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে প্রাণীজ প্রোটিন ত্যাগ করে তার জায়গায় নিরামিষ খাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। প্ল্যান্ট প্রোটিন খেলে ঘুম ভালো হয়। নিউট্রিশন ইনস্টিটিউশনের পাঁচজন গবেষক ইউ.এস-এর তিনটি গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে একথাই জানিয়েছেন। গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রাণীজ প্রোটিনের চেয়ে প্ল্যান্ট প্রোটিন খেলে তা ভালো ঘুমের সহায়ক হবে। সৌরভ দাস নামে একজন স্লিপ মেডিসিন স্পেশালিস্টের মতে ঘুমের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হলো রেড মিট। যেমন পাঁঠা, খাসি, শুয়োরের মাংস, ইত্যাদি ঘুমের বড়ো শত্রু। বরং এক্ষেত্রে দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার, মুরগির মাংসে এই সমস্যা হয় না।

চিকিৎসকরা বলেন যে দিনের তিন ভাগের একভাগ ঘুমের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু তা হতে পারে না আমাদের ব্যস্ত জীবনশৈলীর জন্য। ফলে শরীরে বাসা বাঁধে ঘুমের অসুখ, স্লিপ ডিসঅর্ডার বা সোমনিপ্যাথি। আর তা থেকেই নানাধরনের শরীর খারাপের সূত্রপাত হয়।

দৈনিক কত ঘণ্টা ঘুম জরুরি?

যদি ঘুম না আসার সমস্যা নিয়মিত হয় তখন একে অসুখের উপসর্গ বলে মনে করা হয়। যখন এর পিছনে মানসিক বা শারীরিক রোগের উৎস মেলে না, তখন এটিকে নিদ্রাহীনতার অসুখ (ইনসোমনিয়া) বলা হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ১২ ঘণ্টা, বয়ঃসন্ধিতে ১০ ঘণ্টা এবং প্রাপ্ত বয়সে কমপক্ষে ৭ ঘণ্টা দৈনিক ঘুম দরকার। সেই ঘুমটা রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত জরুরি। দিনের ঘুম কখনই রাতের ঘুমের বিকল্প হতে পারে না। আমাদের শরীরের জৈবিক ঘড়িটা সেভাবেই তৈরি। নাকডাকা কিন্তু একেবারেই ভালো ঘুমের লক্ষণ নয়। প্রবল নাকডাকা মানে অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এতে শ্বাসনালীতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে শরীর কম অক্সিজেন পায়, যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

ঘুমের সমস্যা দূর করার জন্য কী কী করণীয়?

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ও নির্দিষ্ট সময়ে বিছানা ত্যাগ করারও প্রয়োজন আছে। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে টিভি দেখা, উত্তেজক আলোচনা, বাতি জ্বালিয়ে রাখা, গান শোনা ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকতে হবে। মন ও শরীরকে রিল্যাক্সে রাখতে হবে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা কোনো রোগ নয়। সাধারণত ঘুম গাঢ় হওয়ার আগেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। বেশি স্বপ্ন দেখা মানে ঘুমটা বিঘ্নিত হচ্ছে। এমনটা রোজ হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ঘুমসংক্রান্ত অনেক ভালো ভালো ওষুধ হোমিওপ্যাথিতে আছে; যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন। এর জন্য দক্ষ হোমিও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ☐

ডাকটিকিটে রবীন্দ্রনাথ

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

গ্রেট পার্সোনালিটি অফ ওয়ার্ল্ড, ১৯৬১, রুমানিয়া

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ১৯৫২ সালের পয়লা অক্টোবর ছয়জন কবির সমন্বয়ে ডাকটিকিটের একটি সেট প্রকাশিত হয়। সেই সেটে কবীর, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরা ও গালিবের পাশাপাশি নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। এরপর ভারতীয় ডাকবিভাগ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অন্তত ৮টি ডাকটিকিট ও ২টি স্যুভেনির শিট প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ৭টি ডাকটিকিট, একটি স্যুভেনির শিট, একটি মিনিয়েচার শিট। ১৯৫২ সালে ভারতে কবিগুরুর উপর প্রকাশিত ডাকটিকিটের মূল্য ছিল ১২ আনা। পরবর্তী কালে ১৯৬১ সালে বিশ্বকবির জন্মশতবর্ষে বিভিন্ন দেশে তাঁর সম্মানে ও স্মৃতিতে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতীর ৫০ বছর পূর্তিতে ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে ভারত সরকার। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক ‘ডাকঘর’কে তুলে ধরে ভারতীয় ডাক বিভাগ ২০০৮ সালে ৫ টাকা মূল্যের একটি ডাকটিকিট এবং ১৫ টাকা মূল্যের স্যুভেনির শিট প্রকাশ করে। বিশ্বকবির ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে ২০১১ সালে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করে। বিভিন্ন বয়সে কবির ছবি, কবির হাতে লেখা বাংলা ও ইংরাজি কবিতার অংশবিশেষ এবং কবিগুরুর প্রাপ্ত নোবেল পদকের ছবি ডাকবিভাগ প্রকাশিত স্যুভেনির শিটে স্থান পায়।

ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশও তাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানিয়েছে ডাকটিকিট প্রকাশের মাধ্যমে। ১৯৯১ সালের ৭ আগস্ট কবিগুরুর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ৪ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট প্রকাশ করে বাংলাদেশের ডাকবিভাগ। একশো টাকা মূল্যের বাংলাদেশি স্যুভেনির শিটে ডাকটিকিট, পতাকা, জাতীয় সংগীত, কবিতা ও রবীন্দ্র সংগীতের অংশবিশেষ মুদ্রিত হয়েছে।

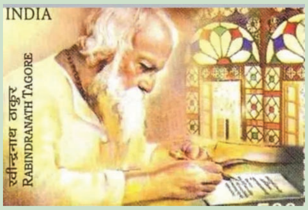

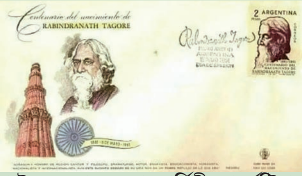

ফাস্ট ডে কভার জন্মশতবার্ষিকী, আর্জেন্টিনা

৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী শিলাইদহ কুঠি বাড়ি বাংলাদেশ, ১৯৯১

মিনেয়েচার শিট ডাকঘর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৪, ভারত

সার্ধশত জন্মবার্ষিকী, ২০১১, উরুগুয়ে

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি রাশিয়া, সুইডেন, রোমানিয়া, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, মোজাম্বিক, ব্রাজিল, চিলি, উরুগুয়ে, টোগো, সিয়েরা লিওন-সহ প্রায় প্রতিটি মহাদেশের নানা দেশ বিশ্বজনীন মহামিলনে বিশ্বাসী মহাকবিকে স্মরণ করেছে ডাকটিকিট প্রকাশের মাধ্যমে। ২০১০ সালে ব্রিটেনের রয়েল মেইল বিশ্বকবির জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১০টি ডাকটিকিট প্রকাশ করে যেখানে কবিগুরুর সঙ্গে আইনস্টাইন, রোমাঁ রোল্যাঁ, গান্ধীজী ও নেতাজীর ছবি ব্যবহৃত হয়েছে।

রবীন্দ্র স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ (দেশভিত্তিক তালিকা) : ভারতে ১৯৫২ সালের পয়লা অক্টোবর, ১৯৬৯ সালের ৭ মে, ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ সালের ২৩ মার্চ, ১৯৮৭ সালের ৮ মে, ২০০৮ সালের ১৩ অক্টোবর এবং ২০১১ সালের ৭ মে তারিখে রবীন্দ্র স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালের ৮ মে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায়/ওই সালেরই ১৩ মে, ২৮ জুলাই ও ২ অক্টোবর তারিখে যথাক্রমে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও রোমানিয়ায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র স্মারক ডাকটিকিট। ১৯৭৭ সালের ১ এপ্রিল মধ্য আফ্রিকায়, ১৯৮২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামে, ওই সালেরই ৩০ ডিসেম্বর বুলগেরিয়ায়, ১৯৯১ সালের ৭ আগস্ট বাংলাদেশে এবং ১৯৯৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলায় রবীন্দ্র স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

১৯৭৩ সালে সুইডেনে, ১৯৭৭ সালে কোমোরোসে এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশ, গ্রেট ব্রিটেন, শ্রীলঙ্কা, টোগো ও মোজাম্বিকে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র স্মারক ডাকটিকিট।

রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতি, পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র সাহিত্যে ও জীবনচর্যায় দেখি প্রকৃতি-প্রেমের নানান মাত্রা। শুধু প্রকৃতি-চিত্রণ নয়, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রকৃতিকে নিয়ে গবেষণা করার একাধিক দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্র-বীক্ষণের একটি দিক হলো তাঁর কৃষি ও উদ্যান চেতনা। কৃষির উন্নতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করার রবীন্দ্র-মানস বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর শান্তিনিকেতন পরিকল্পনা অসাধারণ। রুক্ষ জমিকে সবুজ করার পরিকল্পনা আনন্দদায়ক। শান্তিনিকেতন শ্রীময়ী রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ অজস্র বিদেশি উদ্ভিদের বাংলা নামকরণ করেছিলেন। নীলফুলের লতা পেট্রিয়া ভলুবিলিস-কে ডাকলেন 'নীলমণি লতা' বলে। সাদা ফুলের বৃহৎ বৃক্ষ মিলিংটোনিয়া হরটেনসিসের নাম দিলেন 'হিমঝুরি'। কুইসকোয়ালিস ইন্ডিকার নাম হলো 'মধুমালতী'। গ্লোরিওসা সুপারবা-কে 'অগ্নিশিখা' নামে জনপ্রিয় করলেন। বিশ্বভারতীর সদ্য-স্নাতকরা সমাবর্তনে কবির কাছ থেকে ছাতিম শাখার অভিজ্ঞান লাভ করেছেন। গাছের সবুজ-শ্যামলিমা রবীন্দ্রনাথের মতোই চির নতুন। বনস্পতির বৃহৎ গুঁড়ির মতোই তিনি সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল। শ্যামলতনুর লতাকুঞ্জের মতোই তিনি স্নেহপ্রবণ শিক্ষাবিদ। বহু বিদ্যাবিদের জীবনের পরতে পরতে, চেতনায়-তন্দ্রায়-বোধে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র সাহিত্য গাছের ছায়ার মতোই কর্মব্যস্ততার রোদ্দুরে ছায়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস 'মালঞ্চ'। ১৯৩৪ সালে তিনি লিখেছিলেন মনস্তাত্ত্বিক এই ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি, তার কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি কুসুমোদ্যান— তাতে অসংখ্য দেশি-বিদেশি ফুলের সৌন্দর্য। উপন্যাসের নামকরণ, উদ্যান পরিকল্পনা, বাগিচা-রচনা, পুষ্প সম্ভারের বিপণন— সব কিছুর মধ্যেই তাঁর অনন্য বক্তব্য মুগ্ধ করে পাঠককে। মালঞ্চের প্রেক্ষাপটে ঘটে চলে একের পর এক কাহিনি— আদিত্য, নীরজা ও সরলার আন্তঃসম্পর্ক।

কী আলোচনা নেই সেই উপন্যাসে? ফর্নারি, ছিঁটেবেড়া দিয়ে তৈরি অর্কিড হাউস— তাতে অপরাজিতার লতা, রোজারি, লন, সিড-বেড (কেয়ারি), পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড তৈরির আলোচনা। কামিনী গাছের বেড়ায় Live fencing; সেলিবিস, জাভা, চীন থেকে অর্কিডের introduction; বাড়িভাঙার রাবিশ ব্যবহার করে মালচিং; পোড়া ঘাস-পাতা-মাটিতে দিয়ে হালকা করে ঝুরো করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নামের নাটকটিতে আছে— ওটা এক গোপন কথার মতোই, নিজের ফুল। কেজো জীবনের ফাঁকে কখনও ফুলটি দেখবার সুযোগ পেলে বাঁচার সুযোগ পান অনেকে; দুঃখের ধন হয়ে ওঠে রক্তকরবী ফুল। রঙের তত্ত্বের চাইতেও রাঙা আলোর মশাল জ্বলে ওঠে যেন ফুলটি। 'গল্পগুচ্ছ'-র 'বলাই' গল্পটি অসাধারণ— যেন জৈব বিবর্তনের গল্প। বলাই নামের ছেলেটির আসল বয়স যেন কোটি কোটি বছর আগেকার। বলাই যেন গাছের মতোই, সূর্যের দিকে হাত তুলে বলে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচবো, আমি চির পথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' আমি থাকব, আমি থাকব।' 'গল্পসল্প'-র একটি গল্প 'ধ্বংস', তাতে উদ্যান পালনের প্রতি প্রেম। যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সেই গল্প। প্যারিস শহর থেকে অনতিদূরে একটি ফুলবাগান, নার্সারি। তার মালিক পিয়ের শোপ্যাঁ-র শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রং, তাদের

স্বাদবদল করে নতুন উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি করা। এমন সময় এলো যুদ্ধ! জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের ঘোরতর যুদ্ধ। পিয়েরকে যেতে হলো রণক্ষেত্রে, বাগানের ভার এসে পড়লো মেয়ে ক্যামিলের হাতে। বাগান তারও দিনরাতের আনন্দ, কাজকর্মের সঙ্গী। সে-ও হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে। ইতোমধ্যে যুদ্ধের সাফল্যে পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তকমা। সুখবর দিতে আসেন তিনি মেয়েকে। আর সেদিন সকালেই গোলা এসে পড়ে ফুলবাগানে। বাগানের প্রাণদান করেছিল যে ক্যামিল, তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগান। রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন এইভাবে— 'এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।' অর্থাৎ নিজের সৃষ্টি, নিজের রচনা কেই-বা ধ্বংস দেখতে চায়? ক্যামেল তাই যুদ্ধের আবহে মরে বেঁচেছে, এটাই ঈশ্বরের দয়া। যুদ্ধ যে কতটা অযাচিত তা এই গল্প পড়ে বুঝতে পারেন পাঠক। সবুজের সমারোহই আনন্দ, গাছই হলো আমাদের ফুসফুস। এসব অনুভূতির জন্য আমরা ঋণী রবীন্দ্রনাথের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের দুর্দশা-দুর্গতির কারণগুলি চিহ্নিত করেছিলেন এবং তদানীন্তন সময়ে তার সমাধান কী হতে পারে, কী করণীয় সে বিষয় সম্পর্কেও মত প্রকাশ করেছিলেন (শুভঙ্কর চক্রবর্তী, ২০০৮)। কারণগুলি একত্রিত করা হলো—

১. কৃষকের জমি খণ্ড খণ্ড, সীমানাও বক্রাকার। তাই হাল ঘুরাতে অধিক পরিশ্রম; সময়ও নষ্ট হয় প্রচুর। চাষ কোথাও যথাসময়ে শুরু হলেও কোথাও সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

২. হাল-বদল নিয়ে চাষ করার জন্য উৎপাদন কম হয়।

৩. চাষের খরচ বেশি হওয়ার চাষের আয়-ব্যয়ে সামঞ্জস্য থাকে না, চাষি লাভবান হয় না। ফসলের উপযুক্ত দাম চাষির পক্ষে অধরা। তাদের ভরতুকির ব্যবস্থাও নেই।

৪. অভাব উন্নত বীজের; অভাব সার, সেচ, উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির।

৫. কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একান্তই অভাব। বিদেশি শাসকের কৃষি বিকাশে সদিচ্ছার অভাব যথেষ্ট।

৬. কৃষি প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় বন্যা-খরায় কৃষক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ফসল নষ্ট হলে পরবর্তী ফসল ওঠা পর্যন্ত চরম হাহাকার থাকে।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কৃষি সমস্যার সমাধানগুলি ছিল এইরকম :

১. জমির স্বত্ব জমিদারের কাছে নয়, থাকবে চাষির হাতে। অভাবী কৃষক চাষের খরচ কুলিয়ে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় করতে না পেরে জমি বিক্রি করার চেষ্টা করলে তার বিপরীতে কৃষককে রক্ষার পক্ষে সরকারের সদিচ্ছা ও নীতি থাকতে হবে।

২. সমবায়ের মাধ্যমে একত্রে চাষাবাদই সমাধান, যৌথ কৃষি খামার, ধর্মগোলা নির্মাণ করতে হবে।

৩. পল্লী পঞ্চায়েতকে গুরুত্ব বুঝিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে।

৪. আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তির যথাসম্ভব ব্যবহার করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে হবে। চাষির একলা চাষ করার পরিবর্তে আজ তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে বিদ্বান ও বৈজ্ঞানিককে।

৫. কৃষককে কৃষিকাজে ঋণদান করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থাপন করতে হবে কৃষি সহায়ক ব্যাংক।

৬. উন্নত জাতের বীজভাণ্ডার স্থাপনের পক্ষে তিনি সুপারিশ করলেন। উপযুক্ত সেচ ও সারের ব্যবস্থা করার পরামর্শও দিলেন।

৭. উন্নত জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষার প্রসার ও প্রশিক্ষণের কথা বললেন। বললেন স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা-সহ সুসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করার কথা।

৮. গ্রাম-শহরের বৈপরীত্য ঘোচানোর পরামর্শ দিলেন। কৃষকদের মধ্যে নব প্রাণসঞ্চার ঘটিয়ে অসম্মানের বোঝা সরিয়ে আত্মমর্যাদাবোধে মাথা উঁচু করে চলতে পরামর্শ দিলেন।

৭. ফসল বিপণন ও বাজারের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৮. দরিদ্র চাষি ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হয়। কৃষক জমিদার-জোতদার-মহাজনের দ্বারা শোষিত হয়। চাষির আত্মহত্যার কথাও শোনা যায়।

৯. সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করে সফলতা অর্জন সম্পর্কে চাষি একান্তই অনবগত।

১০. কৃষক সম্পর্কে দেশাত্মবোধীদের অনাদর পরিলক্ষিত হয়।

১১. জমির মালিকানায় কৃষকের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের অভাব রয়েছে।

চাষাবাদে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও দেখবার মতো—

১. পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদার ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে আনলেন যাতে দেশের কৃষিকাজে নিয়োগ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন মহাযজ্ঞে সহযোগীদের মধ্যে দেখতে পাই এলমহার্স্ট, কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষ মজুমদার ও রথীন্দ্রনাথ-কে।

২. নিজের জমিদারিতে স্থাপন করেছিলেন 'পতিসর কৃষি ব্যাংক'। পল্লীর জনহিতে ব্যবহার করানোর লক্ষ্যে নিজের নোবেল পুরস্কারের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সেই ব্যাংকে গচ্ছিত রাখলেন।

৩. শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি সুরুল গ্রামে পল্লীউন্নয়নের জন্য তিনটি ভবন প্রতিষ্ঠিত হলো— পল্লীসেবাকেন্দ্র শ্রীনিকেতন (১৯২২), শিক্ষাসত্র (১৯২৪) নামক দরিদ্র আবাসিক বিদ্যালয় এবং শিল্পসদন যেখানে দরিদ্র ছাত্রদের জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোদ্যোগ প্রয়াস শুরু হয় ১৯০৮ সালে। সে গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। গ্রামকে তিনি বহুবর্ষব্যাপী বিবর্তিত ভারতের সভ্যতার অংশ হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে গ্রাম কেবল সভ্যতার বিচ্ছিন্ন খণ্ড নয়, তা বিশ্বপ্রকৃতি ও পরিমণ্ডলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি পার্থক্য রচনা করলেও সামাজিক লক্ষ্য হচ্ছে এই পার্থক্য থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা এবং তা পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। কবির আত্মপরিচয়েও দেখতে পাওয়া যায় সেই দর্শন অভিন্ন রূপে রয়েছে, 'বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ এবং চিরপুরাতন একাত্মতা।' অর্থাৎ রবীন্দ্র ভাবনায় পল্লীপুনর্গঠিত হবে বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির পরিমণ্ডলের অংশ হিসেবে গ্রামকে পুরোপুরিভাবে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠনের কর্মদর্শন তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ তাঁর এই প্রয়াস ছিল মানবিকতার সঙ্গে জড়িত। প্রায় ৩০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক জমিদারির দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রায় দশ বছর সক্রিয়ভাবে তিনি শিলাইদহ, পতিসর, শাজাদপুরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে ফেললেন। জমিদারির বিস্তীর্ণ অংশে বোটে করে ঘুরে প্রকৃতির পরিদর্শন যেমন করলেন, সেই সঙ্গে নিরীক্ষণ করলেন গাঁয়ের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দূর করার চেষ্টা করলেন গ্রামের বঞ্চনা, অসাম্য, শোষণ। হয়তো পুরোপুরি সফল হননি তিনি, কিন্তু জীবনবোধে অবিচল থেকেছেন চিরকাল। তাই তো ১৯৩৭ সালে শেষবার যখন জমিদারিতে গেলেন, পেয়েছিলেন প্রজাদের অকৃপণ ভালোবাসা।

পল্লীপুনর্গঠনের কর্মকাণ্ডে তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন তাঁর জমিদারি এলাকার মধ্যেই— আত্মশক্তি, সমবায় এবং উন্নয়ন-উদ্বোধনের ব্যবহারিক প্রয়োগ। গ্রামকে স্বনির্ভর করার কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৮৯ সালে কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুরে সালিসি বিচার প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে। ক্ষুদ্র দলাদলি যাতে আপোশে মিটিয়ে গ্রামের শক্তিকে সমবায়ের মাধ্যমে সৃজনশীল করে গড়ে তোলা যায়, তার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। পরে শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠনের প্রয়াসের মধ্যে ছিল সেই কর্মকাণ্ডেরই পরবর্তী সম্প্রসারণ। রবীন্দ্রনাথের গ্রমোন্নয়নের সহযোগী লেনার্ড এলমহার্স্টের সহযোগিতায় ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনের পশ্চিমে সুরুল গ্রামে জন চিপ সাহেবের পরিত্যক্ত অনুর্বর ডাঙা জমিতে উন্নয়নের কাজ। এটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আঙিনার মধ্যে থেকেই সমাজ জীবনের কেন্দ্রে প্রবেশ করার স্বাভাবিক প্রয়াস, কোনো বিলাস বাসনা নয়। এমন উদাহরণ সাম্প্রতিক অতীতে কোথাও ছিল না। পল্লী জীবনের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামাজিক কল্যাণকর্মে ব্রতী হওয়ার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় স্বদেশীয়ানার প্রেক্ষাপটে, স্বনির্ভরতার গুরুত্বের মধ্যেই শ্রীনিকেতন একটি গ্রামীণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠল। ১৯২৪ সাল থেকে সরকারি সাহায্য গ্রহণ করা হলো। কৃষির কাজ দিয়ে শুরু হলো; গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূল লক্ষ্য হলো; তবে সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলির অবহেলা করা হলো না (দীক্ষিত সিংহ, ২০০৮)।

ধানের উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে শাকসবজি, সরষে, তুলো, আখ, পাট, গোখাদ্যের প্রসার ঘটল। স্থাপিত হলো সেচ সমবায়। রায়পুর গ্রামে স্থাপিত হলো কৃষি মজুরদের সমবায়। অজানা ভবিষ্যতে অভাবের প্রয়োজনে স্থাপিত হলো ধর্মগোলা। জৈবসার তৈরির নতুন পদ্ধতি সম্প্রসারণ করা হলো। ব্যবস্থা করা হলো কৃষি বিপণনের। হাল ও দুধেল গোরুর উন্নতি, ছাগল চাষ, মৌমাছি চাষ, ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ, তসর গুটির চাষ প্রভৃতি প্রচলিত হলো।

ম্যালেরিয়া-সহ অন্যান্য রোগের প্রকোপ দূর করতে ১৯২২ সালেই শ্রীনিকেতনে খোলা হলো ডিসপেনসারি; ১৯২৪ সালে ১২টি গ্রামে খোলা হয় স্বাস্থ্য সমিতি, ১৯৩২ সালে ১৬০টি গ্রামকে নিয়ে গঠিত ২৫টি গ্রামবাসীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে।

শ্রীনিকেতন প্রকল্পের অংশ হিসেবে কৃষি উন্নয়নের জন্য গড়ে উঠেছিল নানান সমিতি— ঋণদান সমবায় সমিতি, লেবার কো-অপারেটিভ সমিতি, ধান ক্রয় ও বিপণন সমিতি, সেচ সমিতি। গ্রামের অভাবী ও অনাথ শিশুদের জীবিকাউপযোগী শিক্ষা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হলো এবং তাদের মাধ্যমেই গ্রামের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। স্বাবলম্বী গ্রাম গড়তে কুটির শিল্পের প্রতি মনোযোগ এবং লোকশিল্প পুনরুদ্ধার করার দিকে নজর দেওয়া হলো। প্রতিমা নির্মাণ, চামড়ার উপর বাটিকের কাজ, নকশি কাপড় ও নানান গৃহস্থালি সামগ্রী তৈরি, তাঁতশিল্প, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, পুতুল তৈরি, বাঁশশিল্প, গালাশিল্প, চর্মশিল্প, স্বর্ণশিল্প, লৌহসামগ্রী রচনা ইত্যাদি। ১৯২৯ সালে নারীকেন্দ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গঠিত হয় মহিলাদের দ্বারা গঠিত সমিতি। ১৯৩৬ সালে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে স্বচেষ্টায় শিক্ষিত হতে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেল লোকশিক্ষা সংসদ।

তথ্যসূত্র :

১. দীক্ষিত সিংহ (২০০৮), রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন; কিছু প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্রচর্চার নানা দিগন্ত) ৪১ (১০) ৪৩-৫৪।

২. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৮), রবীন্দ্র তর্পণ, কবিতিকা, মেদিনীপুর, পৃ. ১৭-৩২।

৩. শুক্লা ভট্টাচার্য (২০১০) রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও সাক্ষরতার ভাবনা, শিক্ষাদর্পণ (সার্ধশতবর্ষ রবীন্দ্র স্মরণ) ১৩ (৩ ও ৪) : ৬২-৬৪।

৪. শুভঙ্কর চক্রবর্তী (২০০৮) রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও শিল্পচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্রচর্চার নানা দিগন্ত) ৪১ (১০) : ৩৫-৪২।

সহজপাঠের আনন্দ এবং সবুজের চিত্রকল্প

সম্বিত চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ 'সহজপাঠ'-এ অতি মনোরম ভাবে গাছপালা, ফসল ও অরণ্যের বিবরণ দিয়েছেন সহজ সরল বাক্যে, যা শৈশব পেরিয়ে গেলেও, চুলে পাক ধরলেও আজকের প্রবীণ মন থেকে হারিয়ে যায় না কখনও। এই ক্ষুদ্র আলোচনার পরিসরে বাঙ্গলার শিশুদের জন্য রচিত সেই সাহিত্যিক চিত্রকল্পের অনুসন্ধান করবো। যারা আজ বৃদ্ধ হয়েছেন, অথচ শৈশবে 'সহজপাঠ' পড়েছেন, তাঁদের মধ্যেও ফিরে আসবে একফালি শৈশব।

সে বহুদিন আগের কথা। তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ওয়ান থেকে নানান ক্লাসে পড়ানো হতো সহজপাঠের প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ভাগ। শিশুরা তখন সবে অক্ষর পরিচিতি লাভ করেছে। এবার ধীরে ধীরে ছোটো ছোটো বাক্য লিখতে শিখবে, তার জন্য মুনশিয়ানা চাই। রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভরসা। তিনি গল্প বলার ঢঙে উপস্থাপন করলেন প্রকৃতিপাঠ ও উদ্ভিদবৈচিত্র্যের বর্ণনা।

সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠ, 'কাংলা, তোর ঝুড়িতে কী? ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ।' সারা বাঙ্গলার মানুষ পালংশাক চিনলেও পিড়িং শাক চেনেন না। পিড়িং শাক শীতকালে ভিজে জমিতে জন্মায়, স্বাদ তেতো, বেগুনের সঙ্গে ভেজে খেতে হয়। কার্তিক মাসের প্রথমে বীজ বপন করা চলে। এটি একটি উপকারী ভেষজ— মধুমেহ রোগ সারায়, শরীরের জ্বালা দূর করে, অম্বল ভালো করে। এদিকে পালংশাক শীতকালে ডাঙা জমিতে চাষ হয়, লাগাতে হয় আশ্বিন-কার্তিক মাসে। ফাল্গুন-চৈত্রমাসে বীজ হয়। পালং মুখরোচক ও পুষ্টিকর, কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করে, রয়েছে প্রচুর ভিটামিন-এ।

দ্বিতীয় পাঠে 'বরের বাড়ি অহল্যাপাড়ায়। তিনি আর তাঁর ভাই সৌম্য পাটের ব্যবসা করেন।' একসময় ছিল যখন পাট চাষ ও শিল্প বাঙ্গলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সেদিন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। 'হাট' কবিতায় যে কৃষি ফসল বেচা-কেনা চলে সেখানে রকমারি উদ্যান ফসল এবং মাঠের ফসল দুই-ই রয়েছে, 'জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে/গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।/উচ্ছে বেগুন পটোল মুলো,/বেতের বোনা ধামা কুলো,/সর্ষে ছোলা ময়দা আটা'। সেখানে আর রয়েছে কলসি ভরা এখো গুড় এবং নৌকো বেয়ে আসা খড়ের আঁটি। তৃতীয় পাঠে দেখা যায় মঙ্গলবারে 'পাড়ার জঙ্গল সাফ করার দিন'। তার জন্য 'সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি।' তথ্য আছে ফসলে পঙ্গপালের আক্রমণের কথা, 'এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে। ক্ষিতিবাবুর ক্ষেতে একটি ঘাস নেই। অক্ষয়বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ করে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে।' সে সময় বঙ্গের কৃষিকাজে মারাত্মকভাবে ফসল নষ্ট করতে হানা দিত মেঘের মতো কালো করে আসা পঙ্গপালের দল।

চতুর্থ পাঠে ঘরে যে ফুলদানি রাখা হবে 'তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে।' এ দুই-ই বাঙ্গলার সহজলভ্য ফুল। আকন্দ তো মাঠেঘাটেই জন্মে। কুন্দফুল উদ্যানে কুঞ্জ নির্মাণ করে রোপণ করা হয়। সন্ধ্যা হলে ঘরে ধুনোর গন্ধ দেওয়ার কথা আছে এই পাঠে। পঞ্চম পাঠে রয়েছে কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দেওয়ার কথা। সর্ষেক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েছে। চাষিদের কাজকর্ম সব বন্ধ। সহজপাঠের এখানেই একটি কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে 'পুকুর-পাড়ে জিয়ল গাছের বেড়া', ঝাউতলা। রয়েছে 'ফলসাবনে গাছে গাছে/ফল ধরে মেঘ ঘনিয়ে' আসার কথা। সেখানে 'কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে হাত থেকে ধান' খায়। সপ্তম পাঠে পাওয়া যায় পেস্তা বাদামের কথা, বস্তা থেকে গুন্তি করে ত্রিশটা আলু। আর একটি কবিতায় হাঁক দিয়ে যায় 'আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া'। অন্য কবিতায় 'বাঁশের ডালে ডালে' রোদ ঝিলমিলিয়ে ওঠে।

দশম পাঠে এঁকেছেন রাত্রের পরিমণ্ডল। শোনা যায় 'অশ্বত্থ গাছে পেঁচার ডাক'। কবিতায় রোদ পড়ে 'বাঁশ-বাগানের মাথায় মাথায়/তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায়/হাসায় খিলিখিলি।' আর হারিয়ে পাওয়া আলোতে 'নাচায় ডালে ফিরে ফিরে/ঝুমকো ফুলের লতা।' একাদশ পাঠে জঙ্গল ঘন হয়ে আসে। গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে পড়ে রোদ। প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের উপর কতকগুলো বাঁদর। বনে 'সন্ধ্যা হতেই ঘোর অন্ধকার। কাছে তেঁতুল গাছ।' অসংখ্য জোনাকি গাছে গাছে জ্বলছে। পরদিন সকালে জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা মেলে না, গায়ে বুনো গাছের কাঁটার আঁচড় লাগে। নদীর ধারে ঢিপির 'পরে গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া কুঁড়েঘর। কাছে একটা মস্ত বট গাছ, তার থেকে লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে। সেই গাছে যত রাজ্যের পাখির বাসা। কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে তালপাতার ঠোঙায় চিঁড়ে আর বনের মধু এনে দেয়। দ্বাদশ পাঠে পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউ গাছের জঙ্গল। উনান ধরানোর জন্য বিশ্বম্ভর বাবুর চাকর শম্ভু দা দিয়ে ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধে। মাঝে একটি কবিতায় ডালা ঝুড়ি ধান সবজিতে ভরা। ত্রয়োদশ পাঠে 'পাড়ার প্রান্তে যে বড়ো পুষ্করিণী, তার নাম পদ্মপুকুর।'

এই যে চেনা চিত্র, তা গ্রামবাঙ্গলার স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও কৃষিপণ্য। রবীন্দ্রনাথ তা অতি সহজভাবে আরও নানান দরকারি কথার মাঝে শিশুসাহিত্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গের মানুষ বঙ্গবিচ্যুত হতে চান না, না বাস্তবে, না সাহিত্যে। রবীন্দ্র সাহিত্যে তাই শ্যামল প্রকৃতির সহজ সান্নিধ্য। এর সামীপ্য থেকে অতিবৃদ্ধ-শিশুও বিচ্যুত হবে, তার সুযোগ কোথায়! যদি সহজপাঠ-কে স্কুল স্তর থেকে বহিষ্কার করা না হয়! ■

রবীন্দ্রনাথ : চেতনায় ও চর্চায় লোকসংস্কৃতি

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের বর্ণনা, 'পূজার পরেই বাবা শিলাইদহে গেলেন বোটে, নদীর উপর থাকবেন বলে। কিন্তু তখনো নদীর জল তেমন নামেনি। বালির-চর জাগেনি, শুকনো চর খুঁজে বের করার জন্য নদীর এপার ওপার ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে— এমন সময়ে ঝড়ের লক্ষণ দেখা গেল। বাবা মাঝিদের বললেন, একটি দহের মধ্যে বোট নিয়ে রাখতে। কি ভাগ্য, সময়মতো দহের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, না হলে কি বিপদ ঘটত।' জেলে সমাজের মানুষের একটি চলতি কথা হলো 'দ-এ পড়া', অর্থাৎ দহ-তে পড়া। কথাটির অর্থ হলো বিপদমুক্ত স্থানে অবস্থান করা। এর পেছনে একটি লোকায়ত জীবনচর্যা আছে। জেলে নৌকাগুলো মোহনার কাছে বিক্ষুব্ধ নদীর পাড়ে নোঙর করতে গেলে খুব অসুবিধা হয়। তখন কাছাকাছি নদীর দহে গিয়ে জেলে নৌকাগুলি নোঙর করে। তাতে বান এলেও স্রোতের ধাক্কায় নৌকাগুলি ভেসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাছে দহে নৌকা লাগানোর জ্ঞানটি লোকায়ত জীবনচর্যা-প্রসূত। রবীন্দ্র-চেতনায় গহন স্তরে ছিল এমন বহু লোকসংস্কৃতি।

তার কারণ রবীন্দ্রনাথ যখন যুবক, তেইশ বছর বয়স, তখন পিতার নির্দেশে নিযুক্ত হলেন জমিদারির কাজে। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে খুঁজে পেলেন জীবনের নতুন আনন্দ, নতুন অভিজ্ঞতা। স্পর্শ পেলেন পারম্পর্যগত জীবনের এক আশ্চর্য প্রবাহের। তখনই পরিচয় পেলেন লোকসংস্কৃতির অপূর্ব মণিমাণিক্যের। যতই পরিভ্রমণ করেন, ততই আশ্চর্য হয়ে যান। চমকিত হন বাঙ্গলার পল্লীপ্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষের কৃতি ও কৃষ্টি দেখে। স্থির করে নেন, এসব যতটা পারবেন পর্যবেক্ষণ করবেন, সংগ্রহ করবেন, সংরক্ষণ করে লোকায়ত জীবনদর্শনকে বিশ্লেষণ করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে তারই অমূল্য রতনগুলিকে প্রয়োজন মতো সাহিত্য-সংস্কৃতি-গৌরব সম্পাদনী নানান আসরে প্রয়োগ করবেন। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ১৯০১ সাল পর্যন্ত যে সম্পদের সংস্পর্শে সরাসরি এলেন, তা সংবাহিত করে দিলেন বাঙ্গলার প্রবুদ্ধ জনের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থ (১৯০৭) এমনই সৃষ্টির ভাঁড়ার। তবে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলির প্রাক-রূপ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় আগেই প্রকাশ করে সুধীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি সমান মর্যাদায় লোকসাহিত্যের পতাকা তুলে ধরলেন। এ যে কতবড়ো কাজ, আজকের দিনে ভাবা যায় না। এই বইয়ে স্থান পেয়েছিল চারটি প্রবন্ধ। সেগুলি

হচ্ছে— ‘ছেলেভুলানো ছড়া : ১’, ‘ছেলেভুলানো ছড়া : ২’, কবি- সংগীত ও গ্রাম্যসাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অনুধ্যানকে আলোচনার সুবিধার জন্য দুটি ভাগে ভাগ করছি :

১. রবীন্দ্রনাথের চেতনার অন্তঃস্থলে প্রোথিত লোকসংস্কৃতি।

২. তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চা এবং পরবর্তী লোকসংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অনুপ্রেরণা।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ‘লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী’ বলেছেন। এখন লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি এই দুই শব্দ নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত। ফোকলোরিস্ট অ্যালান ডান্ডিস খুব সহজেই এই বিভ্রান্তি দূর করেছেন। তিনি বললেন (১৯৬৫), ‘To avoid confusion it might be better to use the term Folklore for materials and Folkloristics for the study of the materials. অর্থাৎ Folkloristics বা লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানকে এক কথায় লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান বলা যায় অথবা আরও ছোটো করে লোকসংস্কৃতিচর্চা বলা যেতে পারে।

‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার রূপান্তর সম্পর্কে লিখলেন, ‘একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় বা প্রয়োজন নাই।’ তিনি ওই গ্রন্থে ‘আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে’ ছড়ার চারটি পাঠান্তর দিয়েছেন। তবে আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদদের মতে, এগুলি ‘পাঠান্তর’ না হয়ে ‘কথান্তর’ হবে। কারণ ছড়া মৌখিক সাহিত্য হওয়ায় এবং মুখে মুখে চলতি হয়ে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হওয়ায় তা কথান্তর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারও কারও মতে ছড়ার আদিম রূপটিও খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

কেন ছড়ার ক্ষেত্রে এমন প্রভেদ ঘটে সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, কথার এই কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ‘কামচারিতা’ হচ্ছে কামনার মতো আচরণের ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ‘কামরূপধারিতা’ হচ্ছে কামনা মতো রূপ বদলের ক্ষমতা। ছড়ার রূপবদলের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এমন মতামত দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতির এই স্বভাবই প্রমাণ করে, তা মৃত নয়, সজীব ও সচল সত্তা। বিভূতিভূষণ গুপ্তের ‘বেড়াল ঠাকুরঝি’ গল্প সংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (১০ শ্রাবণ, ১৩৩০), ‘একটি কথা বলা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এই গল্পগুলির কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে।’ অর্থাৎ লোককথাতেও কথান্তর পরিলক্ষিত হয়।

লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংকলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু গানে লোকসংগীতের সুরের প্রভাব রয়েছে। রথীন্দ্রনাথের লেখায় জানা যায়, মাঝিমাল্লাদের মুখে ভাটিয়ালি, সারি ইত্যাদি গান শুনতেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসংগীতের সমঝদার ছিলেন তার সমর্থন মেলে ভাগ্নী সরলাদেবী চৌধুরানীর স্মৃতিকথা ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থেও, ‘যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত— তাঁর মতো সমঝদার আর কেউ ছিল না।’ বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ লিখছেন, ‘বাঙ্গলার লোকসংগীতের সহজ সরল মনমাতানো রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গুরুদেব তার সুর ও ছন্দের অনুকরণে প্রথমদিকে বেশ কিছু গান রচনা করেছিলেন।’ রবীন্দ্রসংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায় ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, দীনেন্দ্র চৌধুরী, সুধীরচন্দ্র কর, গুরুসদয় দত্ত প্রমুখের গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন, মিথ ও লোকসাহিত্য জনজাতির ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। ঐতিহ্যকে তিনি চেয়েছিলেন শিশুমনে প্রসারিত করে দিতে। শিশুর কল্পনাশক্তি জেগে উঠবে তার নিজ ঐতিহ্যের ভিত থেকে। তাই রবীন্দ্রসৃষ্ট শিশুসাহিত্যে রয়েছে মিথ ও লোকসংস্কৃতির বহুল ব্যবহার।

লোকশিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কম ছিল না। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে একটি চিঠিতে (১৯১৫) তিনি চট্টগ্রাম ও বরিশাল থেকে নানান গৃহস্থালির শিল্পদ্রব্য ছাত্রদের মাধ্যমে সংগ্রহ করানোর আবেদন রাখেন। এটাও যে দেশপ্রেমেরই অঙ্গ, দেশহিতৈষী কাজ, তা তিনি ছাত্রদের আগেই বলেছেন (১৯০৫, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ), ‘দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের ওপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।’

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্রে গহনা বড়ি শিল্পীকে লিখেছেন, ‘ইহার শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়জনক’ (শরৎ কুমারী দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবীকে পত্র, ২১ মাঘ, ১৩৪১)। রবীন্দ্রনাথ মাদুরশিল্পের নমুনা সংগ্রহের দিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। লোকশিল্পের সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন এবং বহুল উৎপাদন করা যে প্রয়োজন, তার প্রেরণা আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই নিয়েছি। তিনি বলছেন, ‘বাঙ্গলার আর্ট আইডিয়া ক্রমেই বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে।’

Folk-penology বা লোকদণ্ড বিদ্যা লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের একটি শাখা। লোকায়ত মানুষের নিজস্ব দণ্ডবিধি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কিন্তু ওই শাখায় গিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদের প্রথাগত আলোচনা ও বিশ্লেষণ অতি আধুনিক

বিষয়। রবিঠাকুরের কালে লোকসংস্কৃতির এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু লোকায়ত প্রথাগুলি ছিল তাঁর মনের অন্তঃস্থলে। তাই জমিদারির কাজে প্রজাদের দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, জটিলতা, মনোমালিন্য দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজ জমিদারির নিজস্ব বিধি চালু করেছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমাদের জমিদারির মধ্যে কোনো বিবাদ নিয়ে প্রজারা আদালতে যেত না। বাবা প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মেটাবার একটা পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে বাসিন্দারা তাদের নিজেদের মধ্যে একজন প্রধান মনোনীত করত। ওই গ্রামের প্রধানরা আবার পরগনার পঞ্চপ্রধানকে মনোনীত করত। অল্পস্বল্প ঝগড়াঝাটি গ্রাম-প্রধানরাই মিটিয়ে দিত। মারামারি বা জমিজমা নিয়ে মোকদ্দমা যেত পঞ্চপ্রধানের কাছে বিচারের জন্য। শেষ আপিল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বাবা এই ব্যবস্থা প্রচলন করার পরে তা বহুদিন ধরে চলেছিল, প্রজারাও খুশি হয়ে মেনে নিয়েছিল, সরকারি আদালতে এর চেয়ে সুবিচার পাবে তারা বিশ্বাস করত না।'

এই ধরনের জনপ্রিয় বিচারবিধি নিজস্ব জমিদারির জন্য চালু করেন জমিদার রবীন্দ্রনাথ। প্রশ্ন উঠবে, এই পরিষদীয় শাসনকাঠামোর অনুপ্রেরণা কোথায় পেলেন তিনি? প্রাচীন ভারতের গোষ্ঠীসমাজ থেকে পেতে পারেন তিনি। জনজাতি সমাজেও এ জাতীয় দণ্ডবিধি চালু আছে। অর্থাৎ বিধিবদ্ধ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আসার আগে বাঙ্গলার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ঐতিহ্যগত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা চালু ছিল। এই ব্যবস্থায় জনগণের পার্টিসিপেশন লক্ষ্য করার মতো বিষয়। এই বিষয়টি আকর্ষণ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে।

ফসল সংক্রান্ত নানা উৎসব প্রচলিত আছে বাঙ্গলার পল্লীতে। বাঙ্গলার লোকায়ত সমাজে জমি-তৈরি ও বীজবপন সংক্রান্ত বহু লোকোৎসব হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার ঐতিহ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ১৯২৮-এর বর্ষার শুরুতে শান্তিনিকেতনে পালন করলেন বৃক্ষরোপণ উৎসব। আর শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব। এইভাবে এল ভিতের ঐতিহ্য, শিকড়ের স্নেহধারা। ১৯২৫ সালে কাঁচঘরের বিপরীতে তৈরি হলো তালধ্বজ কুটির, সেখানে প্রকৃতিপাঠের শিক্ষক থাকতেন। ১৯২৬-এ 'কুটিরবাসী' কবিতায় লিখছেন, 'সহজে খুশি তুমি, জানে তা কেবা/ফুলের গাছে তব স্নেহের সেবা', তাঁর তরুবিলাসী সখাকে উদ্দেশ্য করে। ভুবনডাঙ্গার গৌরহরি মিস্ত্রির সঙ্গে গড়লেন শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য, যাকে ড. অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'Folk formal tirbal art architecture.'

রবীন্দ্রনাথ জানতেন, মিথ ও লোকসাহিত্য জনজাতির ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। ঐতিহ্যকে তিনি চেয়েছিলেন শিশুমনে প্রসারিত করে দিতে। শিশুর কল্পনাশক্তি জেগে উঠবে তার নিজ ঐতিহ্যের ভিত থেকে। তাই রবীন্দ্রসৃষ্ট শিশুসাহিত্যে রয়েছে পুরাণ ও লোকসংস্কৃতির বহুল ব্যবহার। পুরাণের ব্যবহার রয়েছে সহজপাঠে— 'ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়। সেখানে কংস-বধের অভিনব হবে। আজ মহারাজ হংসরাজ সিংহ আসবেন। কংসবধ অভিনয় তাঁকে দেখাবে।' কবিতায় সরাসরি রামায়ণের প্রসঙ্গ না এলেও মনোভাবটির মধ্যে রামায়ণের রেশ রয়েছে--- 'ওইখানে মা পুকুরপাড়ে/জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে/হোথায় হবো বনবাসী,/কেউ কোথাও নেই। রাক্ষসেরা ঝোপে-ঝাড়ে/মারবে উঁকি আড়ে আড়ে/দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি/ধনুক নিয়ে হাতে।' এখানে বনবাসী, রাক্ষস, ধনুক প্রভৃতি শব্দগুলি রামায়ণের একটি পরিবেশ তৈরি করেছে।

সহজপাঠে ঘটেছে লোকোৎসবের আসঙ্গ। রয়েছে গাজনতলার কথা (জানো না কি আমার পাড়া/যেখানে ওই খুঁটি গাড়া/পুকুর পাড়ে গাজন তলার বায়ে'); বোষ্টমীর প্রসঙ্গ ('বোষ্টমী গান গাইতে এসেছে, ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, কষ্ট পাবে'); রূপকথার স্পর্শ ('চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই/তেপান্তরের পার বুঝি ওই,/মনে ভাবি ওইখানেতেই আছে রাজার বাড়ি/থাকত যদি মেঘে ওড়া/পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়া/তক্ষনি যে যেতেম তারে/লাগাম দিয়ে কষে'/মন্ত্রের অবতারণা ('হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে/ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে/বাদল বেলার কথা')। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যের মোড়কের মধ্যে লোকসংস্কৃতির আবহ নির্মাণ করে দিচ্ছেন শিশুদের মনে। এরই নাম শিকড়কে শ্রদ্ধা করা এবং শ্রদ্ধা করানো। সংস্কৃতি বাদ দিয়ে লোকজীবন হতেই পারে না।

লোকচেতনাকে রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সম্ভবত সেজন্যই লোকায়ত চেতনা ছিল তাঁর জীবনাচরণের পরতে পরতে। জাতীয়মন্ত্র হিসেবে যে গানটি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন, তাতে 'ধুয়া'-র মতো বার বার ফিরে আসে 'জয় হে' শব্দ দুটি। 'ধুয়া' লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা গীতিকা বা লোকসংগীতে অবস্থান করে মূল উপজীব্যকে আরও জোরদার করে তোলে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য সুরে এগিয়ে যাওয়া গানটিতে 'ধুয়ার' মতো 'জয় হে' অংশটির সুর অবিকল 'হরিবোল'-এর মতো। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, পনেরো শতক যে 'হরিবোল'-এর সুর ভারত-আত্মাকে উদ্বেলিত করেছে একই মন্ত্রে, সেই সুরই জাতীয় মন্ত্রের 'ধুয়া'-র জন্য উপযুক্ত হতে পারে। এখানে কোথায় যেন জাতীয় সংহতি, শিকড় সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্ম সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথের চেতনায় লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান, মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৮, রবীন্দ্র তর্পণ : নির্বাচিত প্রবন্ধ, কবিতিকা, মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা-৬০-৬৩।

২. রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যচর্চা, মানস মজুমদার ২০০৮, পশ্চিমবঙ্গ ৪১ (১০) : ৭৯-৮৬।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাকলী ধারা মণ্ডল ২০০৯, ঐতিহ্য (বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতি চর্চা বিশেষ সংখ্যা) ২ : ১৭-৩৫।

মতুয়া ধর্মান্দোলনে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা

ড. সমীর চন্দ্র দাস

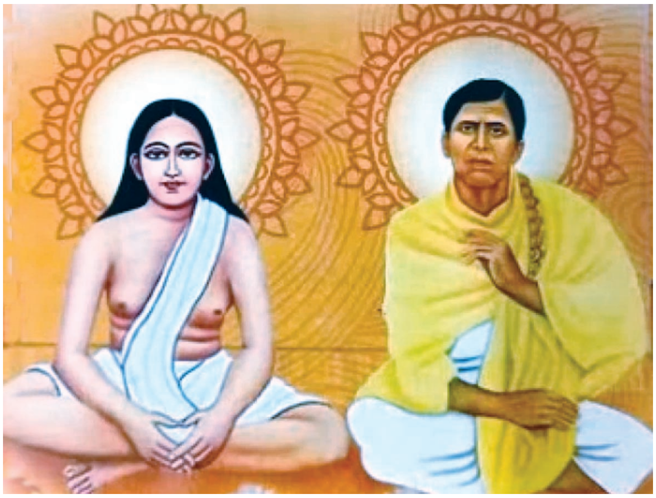

গৌতমবুদ্ধ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্য ঋদ্ধ এক বিপ্লবী ধর্মসমাজ আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার সাফলিডাঙা গ্রামে ১৮১২ সালের ১১ মার্চ। বেঁচে ছিলেন ১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত। তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। তাঁর প্রয়াণ তারিখ ১৯৩৭ সারে ২৬ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ তাঁর জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে এবং তাঁর কর্মসাধনার গোটা সময়টাই (১৮৪৬ থেকে ১৯৩৭) পরাধীন দেশে, অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে। বঙ্গসমাজের দরিদ্র, প্রান্তক মানুষের উদ্ধারকল্পে মহান সমাজ সংস্কারক রূপে আবির্ভূত হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত পরম্পরার অন্তর্ভুক্তি মতুয়া সমাজ। তাঁদের ধর্ম আন্দোলন, সমাজ বিপ্লব, জীবন-সাধনা বিষয়ে তাঁদের নিজেদের লেখা কোনো গ্রন্থ নেই। হরিচাঁদ সামান্য শিক্ষিত ছিলেন, দলিল ইত্যাদি পাঠ করতে পারতেন।

তাঁদের জীবনলীলা বা কর্মসাধনা, দর্শন, মনন ও নির্দেশ বিধৃত হয়ে আছে দুটি মহাগ্রন্থে। মতুয়া ধর্মের মানুষের শ্রেষ্ঠ-শাস্ত্র সে দুটি। হরিচাঁদের জীবন কেন্দ্রিক রচিত তারক সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' এবং গুরুচাঁদের জীবন ও সংগ্রামের কথা লেখা আছে আচার্য মহানন্দ হালদারের 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে। দুটি গ্রন্থই ছন্দে বিধৃত।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদের অবদান

পৃথিবীর ইতিহাসে বহু যুগে বহু দেশে ধর্ম-আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক মনীষী সমাজ সংস্কার, এমনকী সমাজ বিপ্লবের কাজ করেছেন। হরিচাঁদ তাঁর মতুয়া ধর্মকে বলেছিলেন, 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম'। পূর্ববঙ্গের গ্রামে বসে শহরের সংযোগহীন একজন মানুষ বর্ণবাদকে অস্বীকার করলেন। তাঁর ধর্ম আন্দোলনে এলো চার্বাক-বৃহস্পতি-বুদ্ধদেবের উত্তরাধিকার, বস্তুবাদী চিন্তার আলোক। গবেষকরা বলতে পারবেন— এ কী-এক বিস্ময়। তিনি ঘোষণা করলেন—

'জীব দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।'

তার আগের মহাপুরুষরা বলেছেন স্বর্গলাভ, পরকাল, পরজন্ম, মোক্ষ নির্বাণের কথা। তিনি বললেন, এসব স্বর্গলোভ, পাপভয় দেখিয়ে মানুষের মানসিক শক্তিকে আচ্ছন্ন করা হয়। এ প্রসঙ্গের গুরুচাঁদ বলেন, 'অনন্ত শক্তির কেন্দ্র মানবের মন। পাপভয়ে স্বর্গলোভে করে আচ্ছাদন।' ভারতের অন্য কোনো সাধু সন্ত স্বর্গকে লোভের বস্তু হিসেবে ঘোষণা করেছেন কিনা— জানা যায় না। এই ধর্মমত তাই আমাদের ভাষায় এক বস্তুবাদী বিপ্লবী ধর্মমত। যা অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম বলতে আমাদের যেসব পুরনো ধর্মীয়-ধারণা আছে তাকে অতিক্রম করে যায়।

হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন জমিদার দ্বারা অত্যাচারিত, গ্রাম থেকে বিতাড়িত। তিনি সাফলিডাঙা ছেড়ে অদূরে ওড়াকান্দী গ্রামে গিয়ে বাসস্থান স্থাপন করলেন এবং নিজের শক্তিতে গ্রামীণ নমঃশূদ্র-সহ নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সামনে তাঁর মানবতাবাদী ধর্মমতের বিধান, ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তাঁর নানা বিষয়ে যে দৃঢ় ও যুক্তিনিষ্ঠ জীবন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মত, তা গ্রামীণ মানুষের কাছে তাদের ভাষায় ব্যক্ত করলেন। তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

'তন্ত্রমন্ত্র ভেক ঝোলা সব ধাঁধাঁ-বাজী।
পবিত্র চরিত্রে থেকে হও কাজে-কাজী।'
'দীক্ষা নাই, করিবে না তীর্থ পর্যটন।
মুক্তি স্পৃহা শূন্য নাই সাধন ভজন।'
(হরিলীলামৃত : পৃ. ৩২৫)

ব্যক্তি-মুক্তি স্পৃহাকে তিনি

ব্যক্তি-স্বার্থবাদী বলেন। মতুয়ারা চান জাতির উন্নয়ন এবং তা ইহকালেই। তিনি বলেছেন, কৌলীন্য প্রথা ঘৃণ্য; প্রয়োজন নেই গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম গার্হস্থ্য-ধর্ম। তাই তাঁর বাণী :

'হাতে কাম, মুখে নাম।'

তাঁর নির্দেশবাণী উচ্চারণ হলো 'এক নারী, ব্রহ্মচারী।' যেন এক বিপ্লবী বীজমন্ত্রী। এ যুগের তাঁর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও নির্দেশ—

'বাহ্য অঙ্গ ডোর কৌপিন মালা আর।
সব হতে সবারে করেছিল অবসর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইবে যেই।
না থাকুক ক্রিয়াকর্ম হরিতুল্য সেই।।'

গৃহে সব কাজ নিজেরা করবে, সব কাজ শিখবে এই তার নির্দেশ।

'সর্বধর্ম করা ভালো গৃহিণীর পক্ষে।
গৃহস্থের করা ভালো সর্বকার্য শিক্ষে।।'
'যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।
সত্যবাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে।'

এমনকী গৃহীর কাছে তাঁর উপদেশ—

'গৃহস্থের মূলভিত্তি অর্থনীতি বটে।
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এই বাণী রটে।'

তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ বচন—

'মানুষ বলিয়া আর্তি সতত রাখিবে।'

এই মানবিক ধর্মমত তাই গ্রামবাঙ্গলায় সেদিন দাবানল সৃষ্টি করেছিল। কবির ভাষায়—'গ্রামের কাদা জলে কে যেন আগুন জ্বালায়।' এই অগ্নিশিখা কেবল ধর্মক্ষেত্রেই আবদ্ধ হলো না, ছড়িয়ে পড়লো জমিদারি-শোষণ, এমনকী নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও। কারণ তখন অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী জমিদাররা নীল কুঠিয়ালদের সঙ্গে একত্রে গরিব প্রজাদের নিষ্পেষণ করতো, তাই ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার জোনাসুর নীলকুঠি তাঁর নেতৃত্বে অভিযান হয় ও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। লীলামৃতে অভিযান পর্যন্ত বলা হয়েছে,ধ্বংস করার কথা নেই। ব্রিটিশ যুগে কোনো গ্রন্থে এককথায় উল্লেখ থাকা মানে সে গ্রন্থ 'নিষিদ্ধ' হয়ে যাওয়া।

তিনি আর যেসব বড়ো কাজ করেছেন তার প্রতিফলন হয়েছে নমঃশূদ্র-সহ নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে। সেখানে বিধবা বিবাহের প্রচলন তিনি নিজে হাতে করিয়েছেন তার ভক্তদের মধ্যে।

সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো, হরিনামে সংযোগ রেখে সত্যিকার মানবপ্রেমী এক মহান ও হৃদয়বান ধর্মমতের প্রবর্তন করা। যা নিম্নবর্ণের সমাজে এনে দেয় ব্যক্তিত্বের আলো, স্বাস্থ্য-সচেতনতা- শিক্ষা সচেতনতা আর মানবিক মহত্ত্বে উজ্জ্বল এক জীবনবোধ। গার্হস্থ্য ধর্ম কেন্দ্রে স্থাপিত ধন, মান, শিক্ষা আকাঙ্ক্ষী ও ধর্মমতে আরাধ্য মূলত মানুষই; তাই তাঁর মুখে ধ্বনিত সেই বাণী—

'মানুষ বলিয়া আর্তি সতত রাখিবে।'

যা আজও মতুয়া ধর্মমতের প্রাণভোমরা। 'মানুষেতে নিষ্ঠাই' তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মাদেশ। এ আর্তি তো রাজনৈতিক দল থেকে যে কোনো সঙ্ঘশক্তির আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের গুণকীর্তনে ভক্ত কবি লিখেছেন :

'তরিতে কাঙালজনে বুকে দিতে আশা
অন্ধ প্রাণে দিতে আলো মুক মুখে ভাষা
মরা দেহে দিতে প্রাণ জাগাতে সবারে
প্রাণদাতা হরি এল সফলা নগরে।'

হরিচাঁদের পুত্র গুরুচাঁদ জীবনে শিক্ষাবিস্তারকে ধ্রুববিন্দু হিসেবে গ্রহণ করলেন। তার পিতার মহান ধর্মমতকে প্রয়োগ করলেন বাস্তবে। হরিচাঁদের দার্শনিক তত্ত্বের তাই শ্রেষ্ঠ রূপকার শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর। তিনি বললেন,

'মোর পিতা হরিচাঁদ বলে গেছে মোরে।
বিদ্যাশিক্ষা স্বজাতিকে দিতে ঘরে ঘরে।।'

শুধু তাই নয় নারীশিক্ষার প্রতি তাঁদের দৃঢ় মত--- জননী সম্মান মতুয়া ধর্মের মেরুদণ্ড। কারণ, তাদের বোধ, সন্তান কেবল পিতার নয় পিতা-মাতা দু'জনের। এমনকী মাতার অবদান সেখানে বেশি। তাঁর ভাষায় এ আহ্বান—

'আর কথা বলি শোন মন দিয়া।
নরনারী বিদ্যাশিক্ষা কর এক হৈয়া।।
মাতা ভালো নাহি হলে পুত্র ভাল নয়।
মা'র গুণে ছা ভালো লোকে তাই কয়।।'

তাঁর দৃঢ় ডাক—

'প্রয়োজনে করিবে ভিক্ষা
তবু দাও সন্তানের শিক্ষা।।'

পিতার দার্শনিক নীতিকে তিনি যে রণকৌশলে প্রসারিত করলেন। সেখানে ছিল সেনাপতির দক্ষতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, নির্দেশের বাস্তব-বিচার এবং পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্তের স্তরক্রম। তিনি তাঁর পিতার ঐতিহ্যে ঘোষণা করেন বাড়ির দাওয়াখানা, ঘরের বারান্দা, এমনকী গোয়াল ঘর (দুপুরে গোরু মাঠে নিয়ে গেলে), গাছ তলা, নদীর পাড়— সর্বত্র স্কুল বসবে। একজন শিক্ষক হলেই শুরু হোক পাঠশালা। মাতৃভাষায় অক্ষরজ্ঞান। স্কুল গঠন যেন গুরুচাঁদ-যুগে ধর্মের প্রধান অনুশাসন হিসেবে রূপান্তরিত হলো এক সামাজিক আন্দোলনে।

তিনি এই প্রবাহ রক্ষা ও উন্নত করতে ফরিদপুরের খ্রিস্টান মিশন থেকে ১৯০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান পাদ্রি ডাঃ সি.এস. মিডকে আমন্ত্রণ করে আনলেন নিজের গ্রামে। সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রামীণ মানুষের একসভায়। যারা বিরোধিতা করেছেন সাহেব আগমনের তাদের তিনি বুঝিয়েছেন যুগের দাবি, সভ্যতার বিকাশ, উন্নয়নের স্তরক্রম এবং তার জন্য সংগ্রামী এই পদযাত্রার তাৎপর্য বিষয়ে।

গ্রামে কেবল হাইস্কুলই করলেন না, সঙ্গে করলেন স্বাস্থ্য কেন্দ্র--- শিশুমঙ্গল ও মাতৃসদন। করলেন শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র। স্থাপন করলেন নিজের বাড়িতে গার্লস স্কুল। অন্যদিকে সামাজিক জমায়েতের জন্য সমাজের শ্রাদ্ধ বাড়িগুলি হয়ে উঠল সমাজ সংস্কারের সমাবেশ স্থল--- সেখানে পারলৌকিক আলোচনা নেই, আছে সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচি। খাল কাটতে হবে, চাষের অসুবিধা, জমিদারি কর, ছোটো ছোটো বাণিজ্য স্থাপন, সুদখোরদের থেকে ভক্তদের রক্ষা গ্রামীণ ঐক্য, তাদের জন্য নানা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধান।

এ কেবল সভা সমাবেশের বিষয় নয়— ঠাকুরের গদিঘরে নিত্য মানুষের অনন্ত আনাগোনা। সঙ্ঘবদ্ধ মতুয়া বাহিনী সৃজন। আর যে কোনো অত্যাচারের প্রতিরোধে সর্দার বাহিনী প্রস্তুত। লাঠিয়াল বীরেরা নমঃশূদ্র সমাজের মহান গৌরব। অস্ত্র চালনা-সহ লাঠিখেলা তাদের কাছে হয়ে উঠল উন্নত শিল্পকলা। গ্রামীণ অজস্র জীবনমুখী শিল্পচর্চার মতোই। গুরুচাঁদ তাই বলেন—

‘শক্তি না দেখিলে কেহ করে না সম্মান।
শক্তিশালী হতে হবে হও যত্নবান।।’

মায়েদের জন্য তাঁর আহ্বান—

‘বীর মাতা হতে হলে হও বীরাঙ্গনা।
ব্যাঘ্র, সিংহ দেখে যেন হৃদয় টলে না।’

প্রতীকী এ আহ্বানে প্রতিরোধ যুদ্ধে বাহিনীর কেবল পুরুষরাই যান না— যান মেয়েরা ও মায়েরাও। আজও মতুয়া সম্প্রদায়ের যে হরিনাম যাত্রা তাতে দৃপ্ত যুদ্ধের ছন্দ, হাতে সড়কির মতো লাঠি, তার মাথায় লাল পতাকা, আর যুদ্ধবাদের মতোই সে ডঙ্কার আওয়াজ। মেয়েরা বহু ক্ষেত্রেই তার নেতা।

‘কর্মেতে প্রধান হবে ধর্মেতে প্রবল।
বাহুতে রাখিবে শক্তি চক্ষে প্রেম জল।
দুষ্ট ধ্বংসে প্রাণপণ, পতিতে করুণা।
ভীম সম চরিত্রেতে প্রেমে ব্রজাঙ্গনা।’

তাঁর ডাক— আবার যেন জাতিভেদ না জাগে, যেন নতুন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রশ্রয় না পায় ভক্তদের মধ্যে তাই তার নির্দেশ— (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত— পৃ. ৫৭০)

‘সামাজিক নীতি সব শোন ভক্তজন।
জাতিভেদ প্রথা নাহি মানিবে কখন।।’

গুরুচাঁদ ঠাকুরের চেষ্টায় তাঁর পুত্র শশিভূষণ ও নাতি শ্রী প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বিলেতে যান উচ্চশিক্ষার জন্য। যান আরও ভক্ত পুত্রেরা। প্রথম বিধানসভা সদস্য হন নমঃশূদ্র সমাজের অন্যতম রত্ন ভীষ্মদেব দাস।

মতুয়া অনুগামী বিধায়করা সেদিন ভূমিসংস্কার, রায়তি প্রথা, এমনকী তেভাগার জন্য আন্দোলন করেন বিধানসভার ভিতরে এবং গুরুচাঁদের নেতৃত্বে ফরিদপুর-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে (১৯০৯)। এছাড়া ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে প্রাদেশিক কৃষকসভার ৫ম অধিবেশনে গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যান্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আফতাবউদ্দিন চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। তারও আগে ১৯২২ সালের জুন মাসে বরিশাল জেলার পিরোজপুরে যে কৃষক সম্মেলন হয়, সেখানে গুরুচাঁদ ঠাকুরের তেজোদীপ্ত বক্তৃতায় আমূল ভূমি সংস্কারের দাবি উত্থাপন করা হয়, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদও দাবি করা হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র কর্মযোগী গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই কেবল ভারতীয় পরকাললোভী সাধুসন্ত মাত্র ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন গৃহীসন্ন্যাসী আর ধর্ম আন্দোলনের পথে মহান সমাজ বিপ্লবী ; যার ঐতিহ্যবহন করে আজও মতুয়া সম্প্রদায় দেশভাগের ভাঙা বুকে, নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন, ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। সুসংহত করে তুলেছেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ।

সকলেই জানেন শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের ডাক ছিল ‘যার দল নাই। তার বল নাই।’ সঙ্ঘশক্তির এ ডাক সহস্রাব্দের এক ধ্রুপদীবাণী। সাম্যবাদী বিশ্বসংগঠন থেকে ক্ষুদ্র কোনো এলাকার বসবাসকারী মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা এই সূর্যবিন্দুতে এসে সমাহিত। ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। নানা ভাষায় নানা অভিব্যক্তিতে যা মতুয়া ধর্মের সঙ্ঘবাণী রূপে আজও স্পন্দিত, বন্দিত।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রথম প্রয়াণ দিবসে তাই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ‘গুরুচাঁদ এক মহান নেতা, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সমাজসেবক। আমাদের সকলের পূজ্য তিনি।’ একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত আমরা। উপনীত মতুয়া ধর্ম আন্দোলনও। নতুন দেশ, নতুনতর বেশ। কারণ দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের যেসব মানুষের সর্বনাশ হয়েছে সবচেয়ে বেশি তারা এই মাটি-মা’র সন্তান কৃষিশ্রমিক, জলশ্রমিক, কায়িক শক্তি নির্ভর শ্রমশীল বীরজাতি নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য-সহ অন্যান্য অনেকেই মতুয়া আদর্শে পরোক্ষে-প্রত্যক্ষে প্রভাবিত। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এদেশে এসে উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে প্রতিষ্ঠা করেন হরিমন্দির। ভারতের উদ্বাস্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের এমনকী বর্তমানে বিশ্বের সেটি মুখ্য কেন্দ্র। যেখানে তারা ঠাকুরের বাণী বাস্তবায়নে দৃঢ়মত—

‘শিক্ষা স্বাস্থ্য পেলে অজেয় ভূতলে
আর কি বা লাগে ভিক্ষা।।’

তাই এই উদ্বাস্তু ছিন্নমূলদের স্বার্থরক্ষার জন্য পি.আর. ঠাকুর নির্বাচনেও লড়েছিলেন, মন্ত্রীও হয়েছিলেন। আবার তাদেরই প্রতি সরকারি অবিচার অত্যাচারে প্রতিবাদে মন্ত্রিত্বও ত্যাগ করেছিলেন।

বড়মা বীণাপাণি দেবী-সহ তাঁর পুত্র তৎকালীন সঙ্ঘাধিপতি প্রয়াত শ্রীকপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, তাঁর পুত্রবধূ মমতা বালা ঠাকুর-সহ সমস্ত নেতৃত্বের এখন প্রথম দাবি ও আন্দোলনের বিষয় ১৯৫০ সাল থেকে আজও পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের যোগ্য মর্যাদা, নাগরিকত্ব ও জাতিগত শংসাপত্র।

তাই তিনি (বড়মা) উদ্যোগ নিয়ে ২০১০-এর ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় লক্ষ লোকের জমায়েত করেছিলেন যেখানে সব দলের নেতৃত্ব এসেছিলেন। তিনি ওই সভায় ঘোষণা করেন আমৃত্যু তিনি নাগরিকত্ব ও জাতিপত্রের এ আন্দোলন করে যাবেন।

তাই ভাঙা দেহে বারবার নার্সিংহোমে গেছেন তেমনি এই তো সেদিন ঘুরে এলেন ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ঘুরছেন ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। ডাক দিচ্ছেন ১৯৭১-এর পর আসা-সহ সমস্ত উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের জন্য নাগরিক অধিকার, জমির পাট্টা আর জাতিগত পরিচয়পত্র। যে-দাবি হরিচাঁদ গুরুচাঁদেরই মহান ভক্তদের কণ্ঠে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হচ্ছে। সারা ভারতে দলিত দরিদ্র বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের প্রাণে প্রাণে স্পন্দিত হয়ে দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

তবে সংগ্রাম হীন; ঘুমন্ত মানুষের ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকে, তাই ১৮৮১ সালে যেমন গুরুচাঁদ ঠাকুরের জাতির জাগরণের শিক্ষার ডাকে সমগ্র গ্রামবাঙ্গলায় নবজাগরণ এনেছিলেন, তেমনি বড়মা বীণাপাণি দেবী ভারতের দিকে দিকে উদ্বাস্তু বাঙ্গালির অধিকার ও মাতৃভাষার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহান দার্শনিক ধর্মগুরু পতিতপাবন শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের দুইশত আট বর্ষের মহা পুণ্যলগ্নে এই মানবিক আন্দোলন মতুয়া ধর্মমতের আন্দোলনকে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় চরিত্র দিক। শাশ্বত বিজয় ঘোষিত হোক সারা ভারতের মানবিক ধর্মমত মতুয়া ধর্মের,--- এই আমাদের স্বপ্ন, কামনা আর প্রতিজ্ঞা। □

শুভ কাজের প্রশস্ত তিথি অক্ষয় তৃতীয়া

গোপাল চক্রবর্তী

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথি 'অক্ষয় তৃতীয়া' নামে খ্যাত। আচার্য রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ায় সত্যযুগের শুরু হয়েছিল। জনার্দন এই তিথিতে সব সৃষ্টি করেছিলেন, ভগীরথ কঠোর তপস্যার দ্বারা এই তিথিতে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতরণ করিয়েছিলেন। এই শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে জমদগ্নির পুত্র শ্রীবিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ক্ষত্রিয় সংহারক পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী হিসাবেও পালন করা হয়। এই তিথিতে কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। কুবেরের এই তিথিতে লক্ষ্মীলাভ হয়েছিল বলে অক্ষয় তৃতীয়ায় বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা প্রচলিত আছে।

এই পুণ্য তিথিতে পুরীধামে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। উচ্চ হিমালয়ে প্রবল শৈত্যপ্রবাহের জন্য কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি মন্দির, শীতের শুরুতে কার্তিকমাসে বন্ধ হয়ে যায়। মন্দির বন্ধ করার সময় পুরোহিত মন্দিরে এক অক্ষয় প্রদীপ জ্বালিয়ে আসেন। দীর্ঘ ছ'মাস পর অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে যখন আবার মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে সেই দু'মাস আগে জ্বালানো প্রদীপ তখনও জ্বলে।

কথিত আছে, এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনার সূচনা করেছিলেন এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা। এই উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করার বিধান আছে। অনেকে এইদিন জলপূর্ণ কুম্ভ দান করেন। মহিলারা অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতানুষ্ঠান প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ পূজার ব্যবস্থা, জলপূর্ণ কুম্ভ এবং ভোজ্যদান করে থাকেন। অক্ষয় শব্দের অর্থ যা কখনও ক্ষয় হয় না। সনাতনী হিন্দুদের বিশ্বাস এই পুণ্যতিথিতে কোনো কর্ম সম্পাদন করলে তা এবং তার ফল হয় চিরন্তন অর্থাৎ অক্ষয়। এই কারণে এই তিথিতে পুণ্য কামনার বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে।

পুরাণ অনুসারে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অক্ষয় তৃতীয়ার তাৎপর্য কী? শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে— এই তিথি অত্যন্ত সৌভাগ্যদায়ক। এই অক্ষয় তৃতীয়ার দ্বিপ্রহরের আগে স্নান করে যারা জপ, তপ, হোম, যজ্ঞ, শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ, পিতৃতর্পণ, দান ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে তারা আশ্চর্য সৌভাগ্য লাভ করে। মহাভারত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ এই তিথিতে দ্রৌপদীকে অক্ষয় বস্ত্র দান করেছিলেন। এই তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার জন্ম হয়েছিল বলে একটি মত আছে। এই কারণে এই পূজার বিধান আছে। অবশ্য এই বিষয়ে দ্বিমতও আছে। এইদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসার অভিশাপ থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন। হিন্দুদের মতো জৈনধর্মাবলম্বীদের কাছেও অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তিথি। জৈনগ্রন্থ অনুসারে এই তিথিতে রাজা শ্রেয়াংস তীর্থঙ্কর ঋষভনাথকে আখের রস দ্বারা আপ্যায়িত করেছিলেন। এই ঘটনার স্মরণে জৈনরা এই তিথিতে 'আখা তীজ' উৎসব পালন করেন এবং পরস্পরের মধ্যে আখের রস বিতরণ করেন।

অনেক ব্যবসায়ী অক্ষয় তৃতীয়ায় নববর্ষারম্ভ এবং হালখাতা করেন। যে কোনো শুভ কাজের জন্য এই তিথি প্রশস্ত। □

রবি রচনায় ভোজনরসিকতার পরিচয়

দিতি ভট্টাচার্য

'গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়,
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়'
—নিমন্ত্রণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁকে আমরা বিখ্যাত সাহিত্যিক, লেখক হিসেবে সম্মান করার পাশাপাশি প্রখ্যাত ভোজনবিলাসী হিসেবেও জানি। রবীন্দ্রসাহিত্যে কিংবা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিকথায়, জীবনীতে তাঁর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ভাবনার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস ও ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে তার কবিতা থেকে গদ্য ও বিভিন্ন লেখনীতে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার ভোজনরসিকতায় বিখ্যাত ছিলেন, তাই তো তাঁর শৈশবকাল থেকে শুরু হওয়া লেখনীতে বার বার এসেছে বিভিন্ন উপাদেয় খাবারের কথা।

তিনি লিখেছেন, 'বাবা মনে করতেন খাওয়াটা উপলক্ষ্য মাত্র, রান্না ভালো হলেই হলো না--- খাবার পাত্র, পরিবেশনের প্রণালী, ঘর সাজানো, সবই সুন্দর হওয়া চাই। যেখানে খাওয়ানো হবে তার পরিবেশে শিল্পীর হাতের পরিচয় থাকা চাই। মা রান্নার কথা ভাবতে লাগলেন, অন্যরা সাজানোর দিকে মন দিলেন।'

ছড়া লেখার সূচনালগ্নে সম্ভবত নিজের খাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতাই ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন কবি। 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ ফলারের যেরকম বর্ণনা দিয়েছেন—

'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি,
তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ,
চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।'

বাল্যকালের পড়ন্ত বিকেলে তিনি ভাবছেন কেউ তুলছে কোঁচড় ভরে শাক, যা পরেরদিনে কোনো প্রান্তিক দরিদ্রের পাতে উঠবে বা চলে যাবে হাটে, বাজারে।

'আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে
সুয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দি-বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে।'

কখনো তিনি ভালো ছাতু মাখিয়ে আবার কখনো বউঠাকুরনের রান্না করা প্রিয়তম পদ চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি সঙ্গে লঙ্কা দিয়ে মাখা পান্তা খেয়ে রসনা তৃপ্ত করেছেন। আবার তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন এমন কিছু অভাবনীয় পদ যা সম্পূর্ণ মৌলিক। তাঁর 'গুম্ফ আক্রমণ' কাব্যে উল্লেখ আছে :

'বৃহৎ রূপার থালে পাচক ব্রাহ্মণ ঢালে
মাংস পোলাও গাদা গাদা
কি গুণ পাঁঠার হাড়ে অম্বলের তার বাড়ে
কে বুঝিবে ইহার মর্যাদা।'

তাঁর শিশু সাহিত্যে শুরু থেকেই দেখা মেলে বিভিন্ন রকম খাবার ও পদের।

ফঃ ৫

সহজ পাঠের প্রথম ভাগে তিনি দিলেন শিশুদের প্রিয় আম আর মিষ্টির কথা :

'হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ
বসে খায় ক্ষীর খই',
'বাটি হাতে এ ঐ
হাঁক দেয় দে দৈ'
'ডাক পাড়ে ও ঔ
ভাত আনো বড় বৌ'
'ত থ দ ধ বলে, ভাই
আম পাড়ি চল যাই'।

প্রথম পাঠে লিখেছেন—

'পাতু পাল আনে চাল',
'খুদিরাম পাড়ে জাম',
'দীননাথ রাঁধে ভাত'।

দ্বিতীয় পাঠে বলেছেন—

থালা ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা। রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে।

তৃতীয় পাঠে তিনি লিখেছেন—

'মামা আনে চাল ডাল। আর কেনে শাক। আর কেনে আটা। দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আনা দিয়ে। আর, আখ আর জাম চার আনা। বাবা খাবে। আর খাবে মামা। তার পরে কাজ আছে। বাবা কাজে যাবে। দাদা হাটে যায় টাকা হাতে। চার টাকা। মা বলে, খাজা চাই, গজা চাই, আর ছানা চাই। আশাদাদা খাবে।'

চতুর্থ পাঠে আছে পাখির খাবারের কথা। অসুস্থ রানীদিদি তাকে খাওয়ায়—

''এ যে টিয়া পাখি। ও পাখি কী কিছু কথা বলে? কী কথা বলে? ও বলে রাম রাম হরি হরি। ও কী খায়? ও খায় দানা। রানীদিদি ওর বাটি ভ'রে আনে দানা।''

তার ঠিক পরের কবিতাতেই বলা হয়েছে বাঙ্গলার খই, মুড়ি, পান সুপারির গল্প—

হরিমুদি বসেছে দোকানে।
চাল ডাল বেচে তেল নুন,
খয়ের সুপারি বেচে চুন,
ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি,
খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি।
বিধু গয়লানী মায়ে পোয়
সকাল বেলায় গোরু দোয়।
আঙিনায় কানাই বলাই
রাশি করে সরিষা কলাই।

পঞ্চম পাঠে কবি বলেছেন—

আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশি। সেও যাবে কুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়ি-ভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভরে নিয়ে বাড়ি যাব।

সপ্তম পাঠে শৈলর পৈতের আয়োজন। সে যুগের অনুষ্ঠান বাড়ির খাদ্য বর্ণনা—

'ওরে কৈলাস দৈ চাই। ভালো ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ। শৈল আজ খৈ দিয়ে দৈ মেখে খাবে।' নবম পাঠে আছে আবার মুখশুদ্ধির কথা— 'গৌর, হাতে ঐ কৌটো কেন? ঐ কৌটো ভ'রে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।' শেষ হয়েছে আবার খাওয়া দিয়েই— 'চলো, এবার খেতে চলো। সৌরিদিদি ভাত নিয়ে ব'সে আছে।'

তাঁর বিভিন্ন ভ্রমণকাহিনিতেও বারে বারে এসেছে তাঁর খাদ্য রুচি, আর পারিপার্শ্বিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে মতামত।

'জাপানযাত্রী'তে উল্লেখ করেছেন থালাভর্তি ফল সাজিয়ে অতিথি আপ্যায়নের কথা। ফলাহার ছিল তাঁর অতি প্রিয়, অতএব লিখে গেছেন সে অভিজ্ঞতা। 'জাভা-যাত্রীর পত্র' বইতে আছে আমের কথা—

এখানে ভোজনকালে যে-আম খেতে পেয়েছি, দেশে থাকলে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর খেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর বলে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয়নি।'

ইউরোপের খাবারের আলোচনা সমালোচনা নিয়েও কবি ছিলেন সরব। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' বইটিতে তিনি বলছেন—

'ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয় তাতেও কেমন অহৃদয়তা প্রকাশ পায়। কেটেকুটে মশলা দিয়ে মাংস তৈরি করে এনে দিলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি; কিন্তু মুখ-পা-বিশিষ্ট একটা আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা জীবন্ত প্রাণীর মৃতদেহ খেতে বসেছি বলে গা কেমন করতে থাকে।'

আবার তাঁর বিনি পয়সার ভোজে আছে কিছু ভিনদেশি খাবারের উল্লেখ—

'কী বললি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গেছেন? বলিস কী রে! আজ তবে তো রীতিমতো খানা! খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটন-চপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চক্‌চকে করে রেখে দেব। একটা মুর্গির কারি অবিশ্যি থাকবে— কিন্তু, কতক্ষণই বা থাকবে! আর দু-রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা হলে চেঁচেপুঁচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে করে ডজন-দুত্তিন অয়স্টার প্যাটি আসবে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথ কন্যা জয়শ্রীর বিয়েতে লেখেন 'পরিণয় মঙ্গল'—

'যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,
বেশি ব্যয় হয় পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দু' তলায়।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে'।

এখানেও সব রাগ-বিরাগের পাশাপাশি ভোজনকে উল্লেখযোগ্য জায়গা তিনি দিয়েছেন।

বহুচর্চিত কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি কবিতাতেও পাওয়া যায় খাদ্য খাবারের কিছু কথা—

‘উচ্ছে বেগুন পটল মূলো’,
‘সর্ষে ছোলা ময়দা আটা’,
‘কলসি-ভরা এখো গুড়ে’।

তৃতীয় পাঠে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।
কিংবা,
কাঠবেড়ালি ল্যাজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।’

শুধু মানুষ নয়, তাঁর রচনায় বাদ পড়েনি জীবজন্তুদের খাবার কথাও—

‘পাখির ভোজ’ কবিতায়—
‘ভোরে উঠেই পড়ে মনে,
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।’

মিষ্টির প্রতি তাঁর ছিল অমোঘ আকর্ষণ, যা প্রস্ফুটিত হয় তাঁর রচনায়। ষষ্ঠ পাঠে—

পথে যদি জল নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব। সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র কিছু খেয়ে নিক। তার খাবার আগ্রহ দেখি নে। সে ভোরের বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোন ক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।

সপ্তম পাঠে দেখিয়েছেন রান্নার তোড়জোড়—

শ্রীশকে বোলো, তার শরীর যদি সুস্থ থাকে সে যেন বসন্তর দোকানে যায়। সেখান থেকে খাস্তা কচুরি আনা চাই। আর কিছু পেস্তা বাদাম কিনে আনতে হবে। দোকানের রাস্তা সে জানে তো? বাজারে একটা আস্ত কাতলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন। আর বস্তা থেকে গুন্তি করে ত্রিশটা আলু আনা চাই। এবার আলু খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল আনিয়ে নিয়ো। রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রেখো— কড়া চাই, খুন্তি চাই জলের পাত্র একটা নিয়ো। তিনি লিখেছেন ‘সুর ক’রে ঐ হাঁক দিয়ে যায়, আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া।’

আবার নবম পাঠে ‘সঞ্জীবকে ব’লে দেব, তোমার জন্যে মিষ্টি লজঞ্চুস এনে দেবে।’

দশমপাঠে দিয়েছেন প্রণম্য কয়েকজন ব্যক্তির পরিচিতি— ‘বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও। বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্যে চা আনুক আর কিঞ্চিৎ বিস্কুট।’

শক্তিবাবু আর আক্রমের বনের মধ্যে পথ হারানো নানা বিপদ পেরোনোর গল্পে ছত্রে ছত্রে আছে ভোজন রসিকতা— ‘শক্তিবাবু বললেন, এইখানে একটু বিশ্রাম করি। সঙ্গে ছিল লুচি, আলুর দম আর পাঁঠার মাংস। তাই খেলেন। আক্রম খেলো চাটনি দিয়ে রুটি।’

‘কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন ক’রে খেতে দিলে। তালপাতার ঠোঙায় এনে দিলে চিঁড়ে আর বনের মধু। আর দিলে ছাগলের দুধ। নদী থেকে ভাঁড়ে ক’রে এনে দিলে জল।’

‘বাংলাদেশে তো দুটিমাত্র রস-স্রষ্টা আছে। প্রথম দ্বারিক, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ যে তৃতীয় লোকের আবির্ভাব হলো দেখছি।’ (—এই উক্তি লেখক বনফুলের আনা একটি সন্দেশ মুখে দিয়ে বিমোহিত হয়ে।)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আইসক্রিমের কথাও উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি কর্মফল-এ লিখেছেন, ‘ও সতীশ, শোন শোন; তোর মেসোমশায় তোকে পেনেটির বাড়ি থেকে আইসক্রিম খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা।’

আবার ‘ইঁদুরের ভোজ’-এ তিনি চলে গেলেন কল্পনার রাজ্যে, লিখলেন— ‘বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, কার শ্রাদ্ধ? উত্তরে শুনলেন, কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কার। ছেলেগুলো সব সুর করে চেঁচিয়ে উঠল।’

আমাদের প্রাণের কবি, বিশ্বকবি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত ভোজনরসিক, অথচ মিতাহারী। তাঁর খাদ্যাভ্যাস, প্রিয় অপ্রিয় খাবার ও খাবার নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যক্তিগত পরিসর পেরিয়ে বার বার জায়গা পেয়েছে তাঁর রচনাবলীতে। আমাদের প্রিয় কবি এভাবেই বেঁচে থাকুন কথায়, গানে। সঙ্গে রচনায়, আমাদের অন্তরে ও রসনার একদম অন্দরে, অন্দরমহলে। □

জয়তু সংস্কৃতম্ ॐ বিশ্বপোষকম্

সংস্কৃত ভারতী, উত্তরবঙ্গ

আবাসিক প্রবোধন বর্গ-২০২৪

১২ মে থেকে ২১মে পর্যন্ত।। যোগাযোগ-৭০০১০৩৮৬৬৪ /৮২৫০৫৫৯৩৮৫

বর্গস্থান- ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ঘাকশোল, গাজোল, মালদা।

‘আসুন, আমরা পৃথিবীর সকল মানুষকে সংস্কৃত শেখাই’

ডোম্মারাজু গুকেশ ইতিহাস গড়লেন

নিলয় সামন্ত

বিশ্বনাথন আনন্দের পর গুকেশ দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্ট জয়ী হলেন। পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দের জয় এসেছিল ২০১৪ সালে। এক দশক পর মেন্টরকে স্পর্শ করলেন গুকেশ। সেই সঙ্গে বিশ্ব শিরোপা জয়ের জন্য সর্বকনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জার হয়ে নজির গড়লেন। কানাডার টরেন্টোয় ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্ট জিতে ইতিহাস লিখে ফেললেন ভারতের ১৭ বছরের ডোম্মারাজু গুকেশ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানানোর যোগ্যতা অর্জন করে ফেললেন তিনি। বিশ্ব শিরোপা জয়ের জন্য সর্বকনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জার হয়ে নজির গড়লেন।

টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিকারু নাকামুরার বিরুদ্ধে অন্তিম পর্বের খেলা ড্র করে গুকেশ। আর সেইসঙ্গে গুকেশের ঝুলিতে ১৪-র মধ্যে ৯ পয়েন্ট চলে আসে। উল্লেখ্য, বিশ্বনাথন আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে তিনি ক্যান্ডিডেটস দাবা টুর্নামেন্ট জয় করলেন।

অন্যদিকে, ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামার আগে ডি গুকেশ ফ্রান্সের প্রতিযোগী ফিরোজা আলরেজাকে পরাস্ত করে একটা বড়োসড়ো ব্যবধানে জয় হাসিল করেন। এই টুর্নামেন্টে ১৩ পয়েন্টের মধ্যে ৮.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। আর এই জয়ের সুবাদেই নেপোমনিয়াচ্চি, নাকামুরা এবং আমেরিকার ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার থেকে তিনি আধ পয়েন্টে এগিয়ে যান। এই জয়ের পর গুকেশ বললেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি ওই রোমাঞ্চকর ম্যাচটা (ফ্যাবিয়ো কারুয়ানা এবং ইয়ান নেপোমনিয়াচ্চির মধ্যে আয়োজিত) দেখছিলাম। তারপর আমি আমার সতীর্থের (গ্রেগরি গ্যাজেভস্কি) সঙ্গে হাঁটতে বেরোই। আমি মনে করি যে এটাই আমাকে সাহায্য করেছে।'

এই টুর্নামেন্টে জয়ের পাশাপাশি গুকেশ ৮৮,৫০০ ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৮.৫ লক্ষ টাকা) জয় করেছেন। ক্যান্ডিডেটসের মোট পুরস্কার মূল্য ছিল ৫,০০,০০০ ইউরো। বিশ্বনাথন আনন্দ ভারতের এই তরুণ দাবাড়ুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এক্স-এ আনন্দ লিখেছেন, 'সর্বকনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জার হওয়ার জন্য ডি গুকেশকে আন্তরিক অভিনন্দন। তুমি যে সাফল্য অর্জন করেছ, তা নিয়ে গোটা দেশ গর্বিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত গর্বিত। যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তুমি খেলেছ, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই মুহূর্তটা উপভোগ করো।'

আমেরিকার হিকারু নাকামুরার বিরুদ্ধে ১৪তম তথা শেষ রাউন্ডে সহজ ড্র করেন ভারতীয় দাবাড়ু। এর ফলে ১৪-র মধ্যে থেকে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেন গুকেশ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে কারা চ্যালেঞ্জ জানাবেন, তা নির্ধারণ করতেই কিন্তু এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে বছরের শেষের দিকে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীনের ডিং লিরেনের মুখোমুখি হবেন গুকেশ। বিশ্বনাথন আনন্দের পর মাত্র দ্বিতীয় ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে গুকেশ ক্যান্ডিডেটস জিতলেন।

দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ চ্যালেঞ্জার এবং বিশ্বের সেরা তিনের দু'জন যে টুর্নামেন্টে ছিলেন, সেখানে গুকেশকে কেউই ফেভারিটের আশেপাশেও রাখেনি। তবে ফাইনাল রাউন্ড শুরুর আগে গুকেশ লিডেই ছিলেন। তবে নাকামুরা, ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা ও ইয়ানকে দৌড়ে টিকে থাকতে জিততেই হতো। অপরদিকে, ইয়ান-ফ্যাবিয়ানোর ম্যাচ ড্র হলে বিশ্বের তিন নম্বর দাবাড়ু নাকামুরার বিরুদ্ধে ড্র করলেই খেতাব নিশ্চিত হয়ে যেত গুকেশের। দু' ম্যাচের ফলাফলই গুকেশের পক্ষেই যায়। চাপের মুখেও দুরন্ত পরিপক্কতার পরিচয় দেন গুকেশ। নাকামুরার বিরুদ্ধে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলা গুকেশকে শেষ রাউন্ডের ম্যাচে তেমন চাপেও পড়তে হয়নি। ইতিহাস গড়া গুকেশের পারফরম্যান্সে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনও বেশ প্রভাবিত। তিনি ক্যান্ডিডেটস শুরুর আগে গুকেশদের তেমন রেট করেননি। তবে গুকেশ যে তাঁকে চমকে দিয়েছেন তা অকপটে মেনে নিয়েছেন তিনি। কার্লসেন বলেন, আমার পাশাপাশি আরও অনেককেই চমকে দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়। অবশ্য এতে হয়তো আমার এতটা আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। জার্মানিতে গুকেশ আমার কাছে ক্যান্ডিডেটসে কেমনভাবে খেলবে, সেই নিয়ে পরামর্শ চেয়েছিল। তবে আমার কাছে আহামরি কোনও উপদেশ ছিল না। আমি শুধুমাত্র ওকে বলেছিলাম যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলতে। বেশি বাড়াবাড়ি কিছু করার প্রয়োজন নেই। কারণ বাকিরা সকলে সেটাই করবে। প্রয়োজন শুধু সুযোগের সঠিক ব্যবহার করা।' ◻

ডাঃ হেডগেওয়ার রুগ্নালয়

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একটি সেবা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ কিছু চিকিৎসক, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে স্বয়ংসেবক, তাঁরা স্থাপন করেন 'ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর বৈদ্যকীয় প্রতিষ্ঠান'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়টি মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজীনগরে অবস্থিত। সমাজের প্রান্তিক স্তরের, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের সেবা ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ ৭ জন যুবক চিকিৎসক— তাদের কর্পোরেট হাসপাতালের কর্মজীবন, ব্যক্তিগত বৈভব ও সমৃদ্ধির হাতছানি উপেক্ষা করে এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১৯৮৯ সালে স্থাপন করলেন 'ডাঃ হেডগেওয়ার রুগ্নালয়'। মূল্যবোধ ও আত্মোৎসর্গের আদর্শে পরিচালিত হয়ে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও যোগদানে আজ ৩৫ বছর ধরে নিরন্তর সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছে ডাঃ হেডগেওয়ার হাসপাতাল।

১৯৮৯ থেকে এখনও পর্যন্ত ৬০ লক্ষেরও বেশি গরিব মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দান করেছে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর বৈদ্যকীয় প্রতিষ্ঠান (বিএভিপি)। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে একাধিক হাসপাতাল ও অন্যান্য সংগঠন। তিনটি বড়ো হাসপাতাল এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শম্ভাজীনগরে ডাঃ হেডগেওয়ার হাসপাতাল, নাসিকে শ্রীগুরুজী রুগ্নালয় এবং অসমে স্বর্গদেও সিউ-কা-ফা হাসপাতাল। এই হাসপাতালগুলিতে সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা ছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর কোর্সের পঠনপাঠনের সুবিধা ও ব্যবস্থা রয়েছে।

এই হাসপাতালগুলি ছাড়াও একাধিক সংস্থার মাধ্যমে সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত হয়েছে বিএভিপি। গ্রামোন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বস্তিগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা দান, স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণ দান ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে বিএভিপির অধীনে কাজ করে চলেছে সাবিত্রীবাঈ ফুলে মহিলা একাত্ম সমাজ মণ্ডল এবং নাসিকে অবস্থিত সেবা সংকল্প সমিতি। রক্ত সরবরাহ ও ট্রান্সফিউশন মেডিসিনে দক্ষিণ এশিয়ায় এগিয়ে থাকা সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো— দত্তাজী ভালে ব্লাড ব্যাংক। চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছে— ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর মেডিকাল রিসার্চ সোসাইটি। নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যুক্ত রয়েছে— ডাঃ হেডগেওয়ার কলেজ অফ নার্সিং। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার সঞ্চার এবং নীতিবোধ দ্বারা চালিত স্বাস্থ্য পরিষেবা (এথিকাল মেডিকাল প্র্যাকটিস) সংক্রান্ত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠরত ও গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কাজ করে চলেছে— সেবাঙ্কুর ভারত।

৬০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল থেকে যাত্রা শুরু করার ৩৩ বছর পর এই স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থার যখন দেশব্যাপী উপস্থিতি, তখন একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বিএভিপি। ২০২২ সালে গৃহীত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, ডাঃ হেডগেওয়ার হাসপাতালের ৬.৬ কিলোমিটার দূরে ৩৫ একর জমিতে স্থাপিত এই মেডিক্যাল কলেজটির নাম হলো— শ্রীরামচন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস। ভবিষ্যতে ভারতে সেবাব্রতী, মেধাসম্পন্ন যোগ্য চিকিৎসক তুলে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে এই নবনির্মিত মেডিকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছরে এমবিবিএস কোর্সের ১৫০টি আসন, নার্সিঙের বিএসসি, এমএসসি, জিএনএম ইত্যাদি কোর্স, মেডিক্যাল কলেজের অধীনে একটি কমিউনিটি হেলথ্ ইনস্টিটিউশন, সিমুলেশন ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল লাইব্রেরি ইত্যাদি প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষাদান হতে চলেছে এই অত্যাধুনিক মেডিক্যাল কলেজটির বিশেষত্ব। ২০২৩ সালে ভূমিপূজনের পর মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। ২০২৪ সালে মেডিক্যাল শিক্ষার অধীনে প্রথম ব্যাচ ভর্তি হবে। ২০২৫ সালে নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে। মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকবে অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে নির্মিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একটি মন্দির ও একটি বড়ো জলাশয়। নেট জিরো কার্বন নিঃসরণ সম্পন্ন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বর একটি গ্রিন ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে। বিএভিপি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান ডাঃ সতীশ কুলকার্নি বলেন যে মেডিক্যাল শিক্ষা পরিসরে প্রবেশ করতে পেরে তাঁরা রোমাঞ্চিত। মেডিক্যাল শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁরা আত্মোৎসর্গ, সেবা ও সামাজিক সংবেদনশীলতায় সম্পৃক্ত একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের পরিবেশ বা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার প্রয়াসী। মূল্যবোধ, আদর্শ এবং গত ৩৫ বছরে মানবজাতির প্রতি উৎসর্গীকৃত চিকিৎসা পরিষেবার উদাহরণ ও অভিজ্ঞতা তাঁদের সম্বল। সমাজ এই প্রকল্পকে গ্রহণ করবে এবং স্বীকৃতি দেবে— সেই ভবিষ্যতের দিকে তাঁরা তাকিয়ে আছেন। আধুনিক ভারতে স্বয়ংসেবক ডাক্তারবাবুদের দ্বারা পরিচালিত পরিশীলিত চিকিৎসা পরিকাঠামোর প্রতীক হলো বিএভিপি, ডাঃ হেডগেওয়ার হাসপাতাল ও এই নবনির্মিত মেডিক্যাল কলেজ যা আগামী দিনে আন্তর্জাতিক স্তরে হয়ে উঠতে পারে একটি মডেল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। □

তাঁরই বাঁশি ওগো তাঁরই বাঁশি তাঁরই বাঁশি বাজে হিয়া ভরি....

রাজসভা গমগম করছে। সকলেই উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে আছে, কে নীচে জলে ছায়া দেখে অনেক উপরে রাখা রুপোলি মাছের চোখ বিদ্ধ করতে পারে। অনেক রাজা, রাজপুত্র কেউ পারলেন না। অবশেষে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন সেদিন মাছের চোখ বিদ্ধ করে স্বয়ংবর জিতলেন। দ্রুপদকন্যা পাঞ্চালী সেদিন অর্জুনের গলায় বরমালা দিলেন।

পাঞ্চালীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব ফিরলেন কুটিরে। বাইরে থেকেই মায়ের উদ্দেশে তারা বলে উঠলেন, 'মা, দেখো আজ আমরা কী জিনিস এনেছি।' মা ভেতর থেকেই বললেন, 'যা এনেছো পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে নাও।' তারপর শাস্ত্রীয় বিধি মেনে পাঁচ ভাই বিয়ে করলেন পাঞ্চালীকে। পঞ্চপতি হলো পাঞ্চালীর।

এরপর পাঁচভাই ঠিক করলেন, আর তো লুকিয়ে থাকা চলে না। এবার হস্তিনাপুরে যেতে হবে। কিন্তু রাজি হলেন না মা কুন্তী। তিনি পুত্রদের সুরক্ষার জন্য চিন্তিত। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে দ্বারকার সৈন্যসামন্ত আছে।

পরদিন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরা হস্তিনাপুরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামও ছিলেন। অনেকটা পথ অতিক্রম করে হস্তিনাপুরের কাছাকাছি এসে শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে থামতে বললেন। রাত্রিও হয়েছে। শিবির স্থাপন করে

সবাই বিশ্রাম করছিলেন। পাঁচ ভাইয়ের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, হস্তিনাপুর তো কাছেই, তবে এখানে থামতে বললেন কেন বাসুদেব?

দ্বারকাধীশকে তারা জিজ্ঞেস করলেন একথা। দ্বারকাধীশ হস্তিনাপুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ওই দেখো, দূরে হাজার হাজার মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। ওগুলো দুর্যোধনের সেনার হাতের মশাল। ওরা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। ওদের উদ্দেশ্য আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়। আমাদের কিছুক্ষণ আটকে রাখা।'

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুন, 'কেন মাধব, আমাদের কিছুক্ষণ আটকে রেখে দুর্যোধনের লাভ কী'? দ্বারকাধীশ বললেন, দুর্যোধন তার মামা শকুনির সঙ্গে এক পরিকল্পনা করেছে আজ রাতেই সে অন্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবে। তাই আমাদের বাধা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

অর্জুন তখন বললেন, 'তাহলে মাধব, এমনই যদি হওয়ার থাকে তাহলে তো আমাদের আর অপেক্ষা না করে এই মুহূর্তে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করা উচিত, যখন আমাদের সঙ্গে দ্বারকার বিশাল সৈন্যদল আছে'। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওই রক্ষাকবচ ভেদ করে ঢুকতে সময় লাগবে। অত সময় আমাদের হাতে নেই। তোমরা চিন্তা করো না, আমি ইঙ্গিত করলেই যাত্রা শুরু হবে।

সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি। অনেক দূরে এক বনে অপেক্ষা করছিলেন বৈকুণ্ঠস্বামিনী লক্ষ্মীদেবীর অবতার শ্রীমতী রাধারানি। শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে সেখানে গেলেন। রাধারানি শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চাইলেন, শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনের কী উপহার চান। লীলাধর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তিনি শ্রীমতী রাধারানির বাঁশি বাজানো শুনতে চান।

শ্রীরাধা বাঁশিতে সুর তুললেন। সেই বংশীধ্বনিতে চারদিক মোহিত হয়ে পড়ল। আর সেই ধ্বনিতে দুর্যোধনের সকল সৈন্য আবেশে অচেতন হয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত এল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকার সৈন্য-সহ পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরের দিকে ছুটে চলল। সেইসময় দুর্যোধনের রাজ্যাভিষেক চলছিল। রাজপুরীতে প্রবেশ করে পাণ্ডবদের সৈন্যদল সবাইতে ঘিরে ধরল। দুর্যোধন ও গান্ধার নরেশ শকুনি তো অবাক। এও কি সম্ভব? এতো সৈন্য ভেদ করে পাণ্ডবরা এখানে পৌঁছলো কী করে!

সবই সেই বংশীধ্বনির মহিমা। সেই অমৃত বাঁশির সুর, যার সুরে মুগ্ধ হয়ে যেত বরষণা-বৃন্দাবন! এ যে সেই মুরলীধরের বাঁশি, রাধারানির সুর! এ যে রাধা-কৃষ্ণের বাঁশি!

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

নদ-নদী পরিচয়

মধ্যভাগে গঙ্গার শাখানদী — জলঙ্গী

মুর্শিদাবাদ জেলা ও নদীয়া জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত জলঙ্গী নদী। মুর্শিদাবাদ জেলার চর মধ্যবোনার কাছে পদ্মানদী থেকে উৎপত্তি হয়ে ইসলামপুর, ডোমকল, তেহট্ট, পলাশীপাড়া, চাপড়া অতিক্রম করে কৃষ্ণনগরের কাছে এসে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে। এর পরে পশ্চিমমুখী হয়ে মায়াপুরের কাছে স্বরূপগঞ্জে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীটির প্রবাহপথে প্রচুর বাঁক ও অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। ভৈরব নদী এই নদীর সঙ্গে মিলিত হযেছে। জলঙ্গীনদীর বেশিরভাগ জল ভৈরবী নদীই জোগান দেয়। এখন বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময় জল থাকে না। কোথাও কোথাও কচুরিপানায় ভরে গিয়েছে। বঙ্গজীবনে শিল্প ও সাহিত্যে জলঙ্গীর ভূমিকা রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-২১

এতস্য–এর। কস্য – কার? (পুংলিঙ্গ)

এতস্য নাম বিনোদ:। – **এর নাম বিনোদ।**
কস্য নাম বিনোদ: ? –**কার নাম বিনোদ?**

এতস্য নাম কিম্ ?– এতস্য নাম গোপাল:।
এতস্য নাম কিম্ ?– এতস্য নাম সমর:।
এতস্য নাম কিম্ ? –এতস্য নাম প্রলয়:।

কস্য নাম পরিমল: ?
কস্য নাম সৌমিত্র: ?
প্রয়োগ্ –
এতস্য দ্বারা দ্বিত্রাণি বাক্যাণি বদতু ।
পার্থ:, সোমনাথ:, সঞ্জয়:, প্রাণেশ:, রঞ্জিত:, ধনঞ্জয়:, বিশ্বনাথ:।

ভালো কথা

জলসত্র

এবারও খুব গরম পড়েছে। প্রচণ্ড তাপ। গত বছর বাবা ছাদে পাখির জন্য মাটির সরা ভরে জল রাখা শুরু করেছিলেন। এবারও রাখছেন। এবার রাস্তায় কুকুরের জন্যও রাখছেন। পাখির জন্য একবার দিলেই হয়ে যায় কিন্তু রাস্তায় কুকুরের জন্য দুবার জল দিতে হয়। অনেক কুকুর এসে খেয়ে যায়। কাল ঠাকুমা বাবাকে বলল, হ্যাঁরে, পাখি আর কুকুরের জন্য রাখলেই হবে? পথচলতি মানুষদের জন্যও রাখতে হবে। বাবা তখনই বড়ো বড়ো দুটো মাটির মটকা কিনে এনে বাড়ির বাইরের বারন্দায় জল ভরে লাল কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। যাতায়াতের পথে সারাদিনে বহু মানুষ জল পান করছেন। মা দুপুরে একবার দুটো মটকাই একবার করে ভরে দেয়। ঠাকুমা বলল একটু গুড় রাখলে ভালো হতো।

অনন্যা সরকার, নবম শ্রেণী, আগরতলা, ত্রিপুরা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) না ন্ধু ক সি
(২) র র দা খ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) চ চ্চি ভি য় ত্রা ন ল
(২) ধা প্র উ ম প ন্ত্রী ন

২২ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) কবিকল্পনা (২) করুণানিধি

২২ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) উচ্চফলনশীল (২) একমেবাদ্বিতীয়ম

উত্তরদাতার নাম
(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) শতদ্রু ঘোষ, নয়াপাড়া, গাজোল, মালদা
(৩) স্নেহা অধিকারী, নলহাটী, বীরভূম (৪) পুষ্প মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

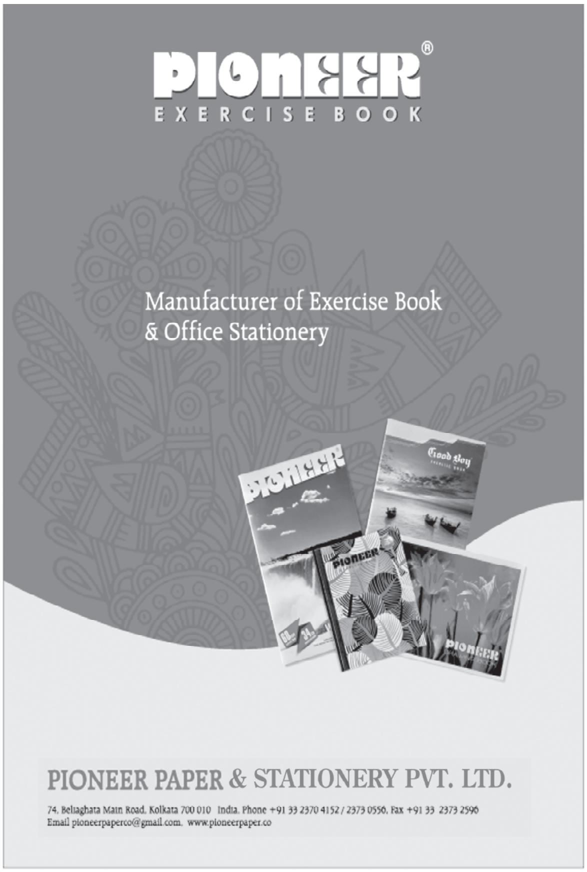

With Best Compliments from -

A

Well wisher

সমবায় ভাবনায় রবীন্দ্র-প্রভা

সঞ্জীব রায়

'সমবায় সমিতি' এই ধারণাটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি সুপরিচিত ধারণা, যা সমস্ত জাতির মধ্যেই কম-বেশি পরিচিতি পেয়েছে ইতোমধ্যে। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হলো— সমষ্টির কল্যাণ সাধন এবং দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা। এটি একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সমিতি, যার মাধ্যমে অবেদানকারীদের পারস্পরিক কল্যাণ সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য। আজকের দিনে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন রকম রূপ নিয়ে থাকলেও মূলত এর সূচনা হয়েছিল ঋণের জোগানের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষ তথা এই বঙ্গদেশে সমবায় সমিতি তৈরি হয়েছিল মূলত কৃষকদের দুরবস্থার উন্নতিকল্পে। সেই সময় কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, কৃষি ঋণের অভাব এবং মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি সুদের ফাঁদ এইসবের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের সুপারিশ মতে এবং তৎকালীন ভাইসরয় কার্জনের দ্বারা গঠিত তিন সদস্যের কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অ্যাক্ট জারি হয়।

কিন্তু আইন তৈরি হলেই তো হবে না। সেই আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা যতক্ষণ না উপলব্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইনের উপযোগিতা লব্ধ হয় না। কিন্তু এই হতভাগ্য বঙ্গে তৎকালীন সময়ে কোনো আইনের সঠিক ব্যবহার মোতাবেক, সহায় সম্বলহীন দরিদ্র কৃষকের জীবনে একটু সুখ এনে দেওয়ার জন্য এই আকর্ষণবিহীন কঠিন কাজটির দায়ভার সম্পন্ন করার মতো অনুভূতিপ্রবণ চিন্তন ও মননসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ছিল খুবই অভাব। কিন্তু সবের মধ্যেও ব্যতিক্রম তো থাকে! সেই রকম একটি ব্যতিক্রমী চরিত্রের নাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৮-১৯ সালে ভাণ্ডার পত্রিকায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সকলের কাছে তুলে ধরেন দেশের দরিদ্র কৃষকদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা এবং সেই প্রেক্ষাপটে সমবায় নীতির প্রবর্তন এবং সংগঠনের উপযোগিতার কথা ব্যাখ্যা করে একটি বিস্তৃত নিবন্ধ লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং তার সমবায় ভাবনার স্বরূপটি-বা কীরকম ছিল এবং তার প্রেক্ষাপটই-বা কতটুকু মসৃণ ছিল তা না হয় একটু তলিয়েই দেখা যাক। ১৮৯০ সাল। পারিবারিক জমিদারির পর্যবেক্ষণের ভার যখন রবীন্দ্রনাথের উপর এসে পড়ে, তখন থেকেই পল্লী-জীবনের সঙ্গে ঘটে তার নিবিড় পরিচয়। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর মানুষ এবং পল্লীর জীবন তার মনকে কতটা যে প্রভাবিত করেছিল তা অনুভূত হয় তার গল্পগুচ্ছ থেকে। পল্লী ভাবনা রবীন্দ্রমননে যে কতটা গভীরে শিকড় গেঁথে বসেছিল, তা বুঝতে পারা যায় সেই সময় লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৫-এর মার্চ) কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি থেকে। ভারতের শিক্ষিত নেতারা যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন জ্ঞান ও রসের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভর করার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। যা তার কর্মীসত্তার প্রকাশটিকে আলোকিত করে তুলেছিল।

বঙ্গদেশে কৃষকদের দুঃখদুর্দশা ঘোচাতে নিজ উদ্যোগে প্রথম তাদের সামাজিক আন্দোলনে শামিল করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে পতিসরে কৃষকদের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। নাম হলো 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক'। পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজের সব টাকা এই ব্যাংকে বিনিয়োগ করেন। উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা এবং সহায়তার অভ্যাস গড়ে তোলা। এই ব্যাংক খোলার পরে বহু গরিব প্রজা ঋণমুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। রবীন্দ্রনাথ তার বাস্তব জীবনে বহু দেশ ভ্রমণ করে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন; বিশেষ করে জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডের সমবায়ের সাফল্যের উদাহরণ সমূহ থেকে তিনি প্রভূত জ্ঞান আহরণ করেন এবং তা স্বদেশে বাস্তবায়িত করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বার্তা ছিল এই রূপ— 'একা অন্ন ভক্ষণ করা যায়, তাতে হয়তো পেট ভরে। কিন্তু পাঁচজন মিলে খেলে পেট ভরে, আনন্দ মেলে এবং সম্প্রীতির ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়।'

জমিদারি দেখভালের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কৃষকদের ভালো-মন্দের ভাবনায় ক্রমাগত নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তার গভীরে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রান্তিক মানুষকে সুসংগঠিত করার নেশা যখন এক প্রকার চেপে বসতে থাকে; তখন তিনি মনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে ফেলেন যে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ছাড়া কৃষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ করা অসম্ভব। খণ্ডিত জমি একত্রে তার চাষাবাদের জন্য তিনি সমবায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তার অন্যতম উদ্যোগগুলোর মধ্যে ছিল— কৃষকদের

ফ ঃ ৬

মধ্যে সমবায় ভিত্তিক সমিতি গঠন করা, শস্যগোলা স্থাপন করা, কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের লাগোয়া সুরুল গ্রামে একটি পুরনো কুঠিবাড়ি কিনে তার লাগোয়া বিস্তীর্ণ জমি কিনে নেন এবং সুরুল গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে থাকে শান্তিনিকেতনের পল্লী সংগঠন কর্মযজ্ঞ। শুরু হলো হস্ত কারুশিল্পের কাজ। চামড়া, সুঁচ, মাটি ও গালার কাজ, সতরঞ্চি বুনন এবং ব্লক ছাপায় যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ। জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ শুরু হয়। চট্টগ্রামের মহিলাদের শিল্প, কাঁথা, বিয়ে উপলক্ষ্যে আলপনা প্রভৃতি এবং গৃহস্থালির দ্রব্য, মাটির, বাঁশের, বেতের কাজ, শাড়ির পাড়ের নকশা নিয়ে শুরু হয় হস্তশিল্পের কাজ সামগ্রী। ১৯২৭ সালে স্থাপিত হলো সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তার আগেই রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল পল্লী উন্নয়ন সমিতি, সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি, ধর্মগোলা, কৃষি ঋণদান সমিতি, সেচ সমবায় এবং সমবায় বয়ন সমিতি। রাশিয়া চিঠিতে 'গ্রামবাসীদের প্রতি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— '...আর সব দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তি সম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তি সমবায়ের সাধনা।' তিনি মনে করতেন যে শহরের এলিটরাই গ্রাম থেকে সম্পদ শুষে এনে বৈষম্যের পাহাড় গড়ছেন।

সেই কারণে তিনি সারা পৃথিবীর আলো পল্লীতে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরশ পল্লীবাসীরও পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে নগরবাসীরও রয়েছে দায়। পল্লীকে আত্মনির্ভর করে তোলার স্বপ্নে তিনি ছিলেন বিভোর। তাই তিনি বলতেন যে 'নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্য ভাণ্ডার ও ব্যাংক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলো আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। (সমবায়-২ প্রবন্ধ)। সমবায় পর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'একলা মানুষ টুকরো মাত্র। মানুষ যদি মিলতে না পারে তাহলে তাদের ভরসার পরিবেশ তৈরি হবে না। ...আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত আছে এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচবো।' ১৯২৯-এর ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে সমবায় নীতি নিয়ে বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশ জনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের আরও একটি স্বপ্ন ছিল তা হলো 'সমবায় খামার' গড়ার স্বপ্ন। তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া'কে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেখানে তিনি হালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার অনুরূপ তৎকালীন সময়ে একটি কার্যকরী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেন। বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত লোকজনকে নিয়ে একটি 'গুচ্ছগ্রাম' গঠন করেন; যা বহুমুখী সমবায়ের সবচেয়ে উন্নত একটি রূপ মাত্র। 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা, যান্ত্রিক চাষাবাদ ও বিপণন প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান সবকিছু সমাধানে তিনি আধুনিক সমবায়ের গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন। তিনি অনেক আগেই চাষিদের সচেতন করে দিয়েছিলেন যে— সমবায় নীতি অনুসারে— চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না (রাশিয়ার চিঠি)। রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন কৃষকদের খণ্ড খণ্ড জমি চাষে এবং বিপণনে কেবল তাদের শ্রম আর অর্থেরই অপচয় ঘটছে না, তাদের সঞ্চিত মূলধনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি মনে করতেন যদি সব চাষি একত্রিত হয়ে একটি গোলায় ধান তুলতে পারতো এবং এক জায়গা থেকেই বিক্রি করতো তাহলে অনেক শ্রম ও খরচ বেঁচে যেত। সমবায়ের মাধ্যমে মূলধনের একত্রীকরণের এটাই সুবিধে। (সমবায়-১, সমবায় নীতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

রবীন্দ্রনাথ সর্বদা বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের দরিদ্র অসহায় কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে মনে হয় এই কো-অপারেটিভ পদ্ধতিই আমাদের দেশকে দারিদ্র্যের হাত হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।' (সমবায়-১, সমবায় নীতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। সমবায়ের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি একত্রিত করে পরবর্তীকালে তাঁতশিল্প পুনর্গঠন এর কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে তার প্রয়োগ হয়। পরবর্তীকালে 'মণ্ডলী প্রথা' প্রবর্তন করে তিনি গড়াই নদীর তীরে জানিপুর, গোহাটা, পান্টিতে সুতা কাটা এবং বিভিন্ন গ্রামে তাঁত শিল্পের প্রসার ঘটাতে সফল হয়েছিলেন। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিচর্যার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয় এই মণ্ডলী প্রথার মাধ্যমে। মণ্ডলী প্রথা হলো সমবায়ের আরেকটি রূপ।

আত্মনির্ভরশীলতার ভাবনা গ্রামবাসীর মধ্যে রোপণের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ছিল কালিগ্রাম পরগনার 'হিতৈষী সভা'। যেখানে প্রজারা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়ে সমিতি গঠন করেছে। এই সভাতেই গ্রামের উন্নয়নমূলক নানা পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট স্থির করা হতো। স্কুল, ডিসপেন্সারি প্রভৃতি নানা কাজের পরিকল্পনা দিয়েছে হিতৈষী সভা। শিক্ষা ও চিকিৎসা এই দুটো ব্যবস্থা করাই ছিল এর প্রধান কাজ।

হিতৈষী সভার টাকা দিয়ে রাস্তা তৈরি করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, কূপ খনন করা, মজা ডোবা, পুকুর উদ্ধার করা— এসব কাজ করা ছিল হিতৈষী সভার পরিকল্পনার অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করেছিলেন তা শুধু নয়; তিনি ছিলেন দরিদ্রের অভয়! তিনি দরিদ্র কৃষকদের বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এই বলে যে, দারিদ্র্যের ভয় আসলে ভূতের ভয়। আর এই ভয় মানুষের ছাড়া ছাড়া থাকার ভয়। তিনি মানুষের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করতে পেরেছিলেন যে, একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো ভরসা; আর সঙ্ঘবদ্ধ-ভরসা হলো মানুষের অভয় ও শক্তি। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে যেমন ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক এবং অন্যাধারে ছিলেন একজন প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ এবং আধুনিক সমবায় আন্দোলনের একজন সার্থক রূপকার— ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের আঙ্গিকে। □

২০২৪-এর ভোট

লড়াই নবাব সিরাজ বনাম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে মহুয়া মৈত্র এবং রাজমাতা অমৃতা দেবীর লড়াই নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িশার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিষয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু আলোকপাত করা হলো—

১৭৫৬ সালে নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর তার ইচ্ছানুসারে প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ মাত্র ২৪ বছর বয়সে নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। আবাল্য সিরাজ ছিল উদ্ধত, দুর্বিনীত, চরিত্রহীন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তিনি একেবারেই জানতেন না। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণের পরেই তার কিছু নিকট আত্মীয় এবং মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর এক বৃহৎ অংশ এবং কিছু হিন্দু ব্যবসায়ী জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হলে সিরাজের নিকট আত্মীয়রা এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে উৎখাতের পাকাপাকি ব্যবস্থায় লিপ্ত হয়। সিরাজের অসংখ্য অপকর্মের মধ্যে সামান্য কিছু ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে দেওয়া হলো।

বর্তমান সময় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান লেখকরা সিরাজের জন্য বুক চাপড়াচ্ছে, তবুও স্বনামধন্য ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন ২৩ জুন পলাশী প্রান্তরে ঘটেছিল নবযুগের সূচনা।

যেদিন সিরাজ মুর্শিদাবাদে সিংহাসন আরোহণ করেন। সেই সভায় ৫ হাজার গণ্যমান্য লোকের সামনে তার বাল্যকালের শিক্ষক হোসেন কুলী খাঁ-কে হাজির করলেন। হোসেন কুলী খাঁ মনে করলেন তার ছাত্র নবাব হয়েছেন অতএব তার কোনো উচ্চ পদ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান কাজির পদ মিলবে। হোসেন কুলী খাঁ এসে তখ্‌তের সামনে সেলাম করে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখামাত্র সিরাজ চক্ষু লাল করে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন--- 'কেঁও হারামজাদা, তুমে ইয়াদ নেহী যা কি হাম একরোজ ইয়ে তখ্‌ত মে বৈঠেঙ্গে' নবাবের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কুলী খাঁ কৃতাঞ্জলি পুটে দাঁড়িয়ে রইলেন। সিরাজ আবার বললেন, উঠিলেন কেঁও জবাব নেহী দেতা ওয়র কা জানা? জল্লাদ সামনে আও। জল্লাদ তখ্‌তের সম্মুখে উপস্থিত হলে

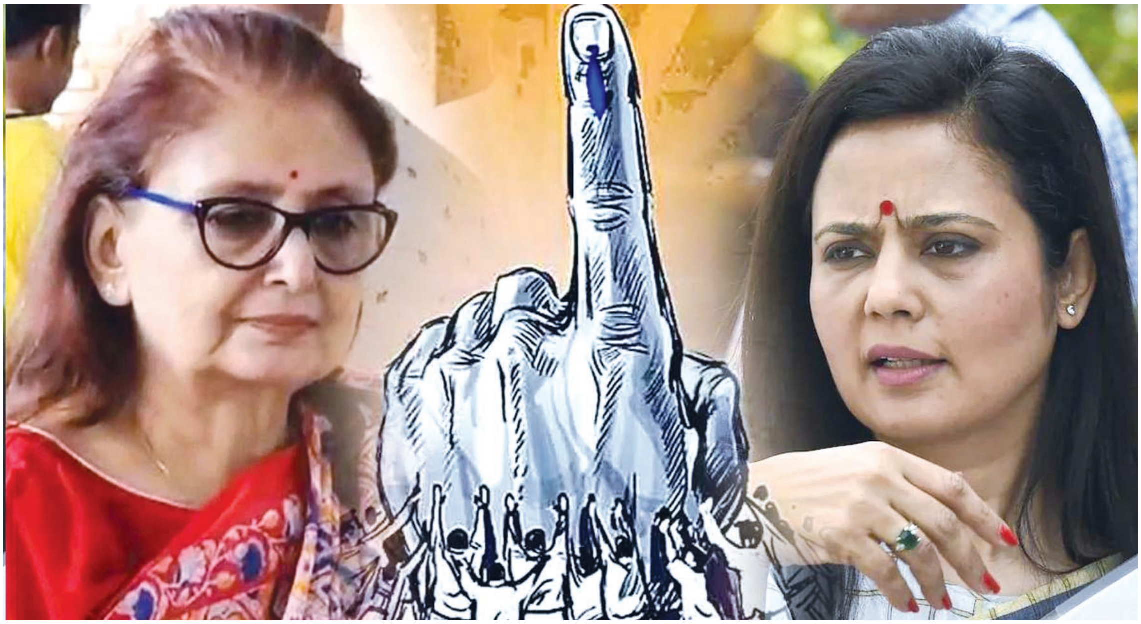

অমনি সিরাজ উচ্চঃস্বরে হুকুম করলেন, 'ইস বজ্জাৎ কো কোতল করো'। জল্লাদ উপায় অন্তর না দেখে হোসেন কুলী খাঁর হাত ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সিরাজ তা করতে দিলেন না, বললেন 'বজ্জাত কো বাহার মত লে যাও, ইনকো হামারে সামনে কোতল করো' হোসেন কুলী খাঁর অপরাধ ছিল তিনি বালক সিরাজের শিক্ষক থাকা কালে অন্য বালকদের মতো ব্যবহার করতেন এবং বেত্রাঘাত করতেন অন্য বালকরা গুরুর বেত্রাঘাত ভুলে যায় কিন্তু সিরাজের চরিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। ৫ হাজার গণ্যমান্য লোকের সামনেই হোসেন কুলী খাঁর ঘাড়ে কোপ পড়ল। কেউ টুঁ শব্দ করতে বা সাহস দেখাতে এগিয়ে আসেননি। কাটা মুণ্ডুটা মাটিতে কয়েকবার উলটপালট খেয়ে কী একটা জিনিসে আটকে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখে দুটি চক্ষু মেলে স্থির হয়ে রইল। কাটা ধড়টা ছটফট করে রক্ত উদ্‌গিরণ করে এক পাশে পড়ে রইল। হোসেন কুলীর শিরশ্ছেদ হওয়ার পর তাঁর দেহ ও মুণ্ডুটা একটা থলির মধ্যে রেখে মুখ বন্ধ করে প্রথানুসারে ওই থলিটা একটা হাতির পীঠে গোরস্থানে প্রেরণ করা হলো। কথিত আছে, মুর্শিদাবাদের চকের মধ্য দিয়ে যখন হাতিটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছিল তখন একস্থানে সে হঠাৎ থেমে রইল। মাহুত এর কারণ জানবার জন্য মাটির দিকে তাকাল, দেখল থলে থেকে কিছু রক্ত হাতির গা বেয়ে মাটিতে ফোঁটা ফোঁট পড়ছে। হাতিটা শুড় দিয়ে তাঁর ঘ্রাণ নিচ্ছে। অনেক প্রহারের পর হাতিটি পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করল।

সিরাজের সদৃষ্টেও অনুরূপ ঘটে ছিল। মহম্মদী বেগের হাতে সিরাজের শিরশ্ছেদের পর যখন মৃতদেহ সেই হাতির পিঠে করে সেই মাহুত গোরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল। মাহুত দেখল হাতিটি দাঁড়ানো মাত্র সিরাজের দেহ থেকে কিছুটা রক্ত হোসেন কুলীর গোরস্থানের উপর পড়তে আরম্ভ করল। লোকে বলে হোসেন কুলীর হত্যার এই রূপ প্রতিশোধ হয়েছিল। (তথ্যসূত্র সেকালের দারোগার কাহিনি, লেখক গিরিশ চন্দ্র বসু প্রথম প্রকাশনা ১৮৮৮)।

সিরাজের মাসতুতো ভাই শওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধের খরচ হিসেবে জগৎ শেঠ-মানিকচাঁদের উত্তরসূরি মাহতাব চাঁদের কাছে ৩ কোটি টাকা চাইলেন। তিনি মুখের উপর না করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ তার গালে চড় মেরে হাজতে ভরে দিলেন। মাহতাবের কন্যা অসামান্যা সুন্দরী দুহিতাকে করায়ত্ত করার জন্য সিরাজ শেঠ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন সন্ধ্যার একটু পরে। রূপ দেখে মাথা ঘুরে গেল সিরাজের। জড়িয়ে ধরলেন কন্যাকে। তিনি ঝটকা মেরে মুক্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর কাছে অভিযোগ জানালেন। শেঠ জামাতা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পায়ের জুতো খুলে ১০০ বার আঘাত ও কিল চড় ঘুসি খেয়ে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন সিরাজ। কয়েকদিন পর ব্যস্ত এক সকালে জনাকীর্ণ রাজপথে শেঠ জামাতার মুণ্ডুটা দেহ থেকে আলাদা করে দেওয়া হলো এক কোপে। রাস্তার সমস্ত লোক ছুটে পালাল, একটি রুপোর থালায় মুণ্ডুটা রাখা হলো, বহুমূল্য একটা আচ্ছাদন দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো শেঠ দুহিতার কাছে। তাতে লেখা 'নবাবের প্রীতি উপহার'। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত হিন্দু সমাজ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আবেদন জানালেন সিরাজকে বাঙ্গলার মসনদ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। নাটোরের রানি ভবানীর অসামান্যা সুন্দরী বিধবা কন্যাকে হস্তগত করার উদ্যোগ নিয়েছে সিরাজ। এই সংবাদ পেয়ে রানি কন্যাকে নিয়ে নৌকা করে বারাণসী চলে যান। ওই সময় হিন্দু মহিলাদের গঙ্গাস্নান বন্ধ হয়ে যায় সিরাজের অনুচরদের উপদ্রবে। তার নিষ্ঠুরতার একটি উদাহরণ হলো মাঝ গঙ্গায় যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে কীভাবে যাত্রীরা বাঁচার চেষ্টা করছে তা দেখে আনন্দ উপভোগ করা।

মুর্শিদাবাদে তিনি কেমন ঘৃণার পাত্র ছিলেন তার একটা উদাহরণ হলো যুদ্ধে জয়ী হয়ে ২০০ ইংরেজ এবং ৫০০ দেশীয় সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ প্রবেশ করলেন মুর্শিদাবাদে। স্থানীয় অধিবাসীরা নির্লিপ্ত ভাবে এই পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে রইলেন। ইচ্ছা করলে জনতা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু জনতা ছিল নির্লিপ্ত।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুঙ্গের দুর্গে সপুত্র বন্দি হয়ে মীরকাশিমের পতনের পর মুক্তিলাভ করেন।

যদিও বর্তমান সময় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান লেখকরা সিরাজের জন্য বুক চাপড়াচ্ছে, তবুও স্বনামধন্য ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন ২৩ জুন পলাশী প্রান্তরে ঘটেছিল নবযুগের সূচনা। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের অনেক মনীষী সিরাজের পরাজয় এবং ইংরেজের আগমন ভারতের নবযুগের সূচনা এবং ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সর্বশেষে আর একটা কথা উল্লেখ না করলে বিষয়টি অসমাপ্ত থাকাবে বলে মনে করছি। দেশভাগ কমিশনের অধিকর্তা র‍্যাডক্লিফ সাহেব প্রথমে যে পুরনো দেওয়াল ক্যালেন্ডারে পেনসিলের দাগ দিয়েছিলেন তাতে নদীয়ার গঙ্গার পূর্ব পাড়কে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণনগর শহর, মায়াপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, করিমপুর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগর সরকারি অফিসে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। তখন কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের হস্তক্ষেপে ওই অঞ্চল ভারতভুক্ত হয়। ওই সময় নদীয়ার জেলা শাসক ছিলেন একজন মুসলমান। তিনি তিনদিন পর এখান থেকে যাওয়ার সময় ট্রাক বোঝাই করে কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসের সমস্ত বিলেতে তৈরি ক্রকারিজ এবং আসবাবপত্র নিয়ে যান। তাই নদীয়াবাসীকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, রাজপরিবারের প্রচেষ্টাতেই এক বিরাট অঞ্চল ভারতভুক্ত হয় এবং অসংখ্য উদ্বাস্তু ওই অঞ্চলে পুনর্বাসন পায়। □

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সরকারের বড়োই প্রয়োজন

ড. রামানুজ গোস্বামী

আবার আক্রান্ত হলো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার টার্গেট এনআইএ। আসলে দেশদ্রোহী জঙ্গিদের মদতদাতা তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ইডি, সিবিআই, বিএসএফ সবাই যখন আক্রান্ত, তখন এনআইএ-ই বা বাকি থাকবে কেন! বিশেষত ভারতবিরোধী কার্যকলাপে মদত দেওয়া, ভারতীয় আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো, রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশে সবরকম ভাবে সাহায্য করা ইত্যাদি যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে পড়ে, সেখানে এনআইএ-কে তো তদন্তে বাধা দিতেই হবে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমানদের 'জন্নত' বানানো, পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করবার যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরবর্তী ক্ষেত্রে এবং বিশেষত বাম জমানায়, বর্তমানে তৃণমূল আমলে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তৃণমূলের কাছে আগে চুরি, পরে রাজ্য বা দেশ। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভারত যদি ভেঙে গিয়ে শতটুকরোও হয়ে যায়, তবুও তৃণমূল কংগ্রেসের তাতে কিছুই আসে যায় না। তাদের টাকার পাহাড় তৈরি হলেই হলো। এটাই বাস্তব সত্য।

অতীত থেকে মানুষ শিক্ষা নিয়ে থাকে। এবারে তাই তৃণমূলের দেশবিরোধী মানসিকতার কিছু প্রমাণ তথা নিদর্শন দেখা যাক। আশা করাই যায় যে, এই সকল নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে বিপুল ভোটে পরাজিত করবেন।

কী করে পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক জঙ্গিদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করা যায়, সেই বিষয়ে তৃণমূল সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সুদূর বেঙ্গালুরুর বোমা বিস্ফোরণের অভিযুক্ত জঙ্গিরা দিনের পর দিন পরম নিশ্চিন্তে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে পারে।

১. তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যসভায় পাঠায় আহমেদ হাসান ইমরানকে, যে নাকি ভারতের নিষিদ্ধ ইসলামিক ছাত্র সংগঠন সিমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল। উল্লেখ্য যে, এই ইসলামিক ছাত্রসংগঠনটি হলো একটি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন। এছাড়াও গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, জেএমবি নামক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল এই ইমরানের।

২। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অশালীন উক্তি, গালিগালাজ ও তুই-তুকারির জন্য চিরদিনই প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে সত্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যতিক্রমীই বলতে হবে। কারণ, এহেন অশালীন উক্তি ভারতের আর কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা যায় না। পাশাপাশি দেশের সার্বভৌমত্বকে বারে বারে আঘাত করা এবং ভারতের মধ্যে ও বাইরে দেশের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করে তোলবার ক্ষেত্রেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহেই ব্যতিক্রমী। বিভিন্ন সময়ে তিনি একাধিক মন্তব্য করে থাকেন, যা ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ সালের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরে তিনি এই বিষয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (যারা দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত) আরএডব্লুউ-কে দায়ী করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় কয়েকজন জঙ্গির যারা ওই বাড়িতে বসে বোমা তৈরি করত ও নাশকতার ছক কষত।

৩। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিভিন্ন সংগঠনের জঙ্গিদের। এরা সকলেই কোনও না কোনও নাশকতামূলক ঘটনা বা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে

দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বহু সংখ্যক জঙ্গিকে। উল্লেখ্য যে, এই সকল জঙ্গিদের একটা খুব বড়ো অংশই কিন্তু আদতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।

৪। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসএফের কাজকর্মে কোনওদিনই খুশি নন। তাই বিএসএফ যাতে গ্রামে গ্রামে ঢুকে তাদের নির্দিষ্ট কাজ সঠিকভাবে করতে না পারে ও বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই দিকে তিনি যথেষ্টই সচেষ্ট। একইভাবে ইডি, সিবিআই এনআইএ-র মতো সমস্ত তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করে থাকেন। বস্তুত যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকার কারণে দেশ ও দেশের মানুষের সার্বিক নিরাপত্তার সঙ্গে সবরকম আপোশ করতেও তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত নন।

৫। এটা সর্বৈব সত্য যে, রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে এই রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে একটা বিশাল এলাকার সীমানা একেবারেই অসুরক্ষিত এবং নির্বিচারে চলে চোরা কারবার ও বেআইনি অনুপ্রবেশ। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বারে বারে এই বিষয়ে রাজ্যকে সতর্ক করা হলেও রাজ্য সরকার এই বিষয়ে মদতই দিয়ে থাকে। কারণ, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক। তাছাড়া, এই সকল চোরাকারবারে যে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা যুক্ত, তা তো আজ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

৬। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শাসনকালে ভুয়ো আধারকার্ড, পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড ইত্যাদির ব্যবসা একেবারে রমরমা হয়ে উঠেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গিরা সহজেই জাল নথিপত্রের দ্বারা এই রাজ্যে বসবাসের সুযোগও পাচ্ছে। প্রসঙ্গত, মায়ানমার ও বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের কথা তো এক্ষেত্রে বলতেই হয়। তৃণমূল সরকার এদের জন্য একেবারে দিলদরাজ। পাশাপাশি রয়েছে তৃণমূলের আশ্রিত শাজাহানের মতো কুখ্যাত অপরাধীরা, যারা নানাভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও তাদের এদেশে বসবাসের ব্যবস্থা করে থাকে।

৭। ঘোষিতভাবেই তৃণমূল সিএএ-এর বিরোধী। তাই সম্প্রতি সারা দেশে সিএএ চালু হওয়ার পরও তৃণমূল নেত্রী ভারতের সংসদে অনুমোদিত ও মহামহিম রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর করা এই আইন মানতে রাজি নন। তবে তিনি মানবেনই-বা কেন? এতে করে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী জেহাদিদের ('দুধেল গাই) অসুবিধা হয়ে যাবে, তাই এটা মানা সত্যিই মুশকিল। তাছাড়া এরা তো মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গাই!

৮। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাস খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বোঝাই যায় যে, মিনি পাকিস্তান নয়, একেবারে গ্রেটার পাকিস্তান বা গ্রেটার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে তৃণমূল। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের এই প্রত্যাশাই থাকবে যে, আগামীদিনে এই রাজ্যের সরকারি ভাষা হবে উর্দু। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে ইসলামীকরণ ঘটে চলেছে। বিষয়টা অত্যন্ত উদ্বেগের।

সম্প্রতি ভূপতিনগরের বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে গিয়ে দারুণ ভাবে নিগৃহীত হতে হয় এনআই-এর আধিকারিকদের, ঠিক যেভাবে রোহিঙ্গা ও তৃণমূলি গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। অবশ্য ঘটনাটিকে লঘু করে দেখানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী 'চকোলেট বোমা' তত্ত্ব খাড়া করেছেন। যাইহোক, এটা তো খুবই স্পষ্ট যে, তৃণমূলের কাছে ভারত ও ভারতবাসীর নিরাপত্তার গুরুত্ব একেবারেই নেই। কী করে পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক জঙ্গিদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করা যায়, সেই বিষয়ে তৃণমূল সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সুদূর বেঙ্গালুরুর বোমা বিস্ফোরণের অভিযুক্ত জঙ্গিরা দিনের পর দিন পরম নিশ্চিন্তে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এনআইএ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারছে।

তাই এখন সময় হয়েছে এই দেশবিরোধী তৃণমূলি অপশাসনের অবসান ঘটানোর। এই রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা যদি নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষিত রাখতে চান, জীবন ও সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করতে চান, আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক রাজ্যে পরিণত হওয়া থেকে আটকাতে চান, আরও একবার সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হতে না চান, তবে এই লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে পথ চলা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সিয়াচেনের কাছে চীনা হাইওয়ে তৈরিতে উদ্বেগে ভারত

স্বস্তিকা পত্রিকার গত সংখ্যাতে এই কলামেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বিশ্বের সর্বোচ্চ সামরিক অঞ্চল সিয়াচেন পরিদর্শনে গিয়ে কঠিনতম পরিস্থিতির মধ্যে দেশের সেনা এই অঞ্চলকে রক্ষা করছেন বলে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং সেই সূত্রে পাকিস্তানকে সতর্কও করেন। প্রসঙ্গত, এবছর মার্চের পর দু'দুবার সিয়াচেনে যান ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তার পরেই ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক একটি তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, সিয়াচেনের 'কান ঘেঁষে' তৈরি হয়েছে চীনা হাইওয়ে। এর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভারতীয় সেনার ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য লেফটেন্যান্ট রাকেশ শর্মা। উল্লেখ্য যে, পূর্ব লাদাখ, কার্গিল ও সিয়াচেন হিমবাহ এলাকায় মোতায়েন থাকে এই বাহিনী। রাকেশের বক্তব্য, 'এইভাবে সড়ক নির্মাণ একেবারেই বেআইনি। ভারতের উচিত চীনের কাছে কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ জানানো।'

ঘটনা হলো, সম্প্রতি একটি উপগ্রহচিত্র প্রকাশ করেছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ও ম্যাক্সার টেকনোলজিস্। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পাক-অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ডে শাকসগাম এলাকায় (সামরিক পরিভাষায় যাকে ট্রান্স কারাকোরাম ট্র্যাক্ট বলা হয়) হাইওয়ে নির্মাণ করছে চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালেই জম্মু ও কাশ্মীরের ওই এলাকা দখল করেছিল পাক সেনা। পরে, ১৯৬৩ সালে ওই এলাকাটি চীনের হাতে তুলে দেয় তারা। তারপর থেকে সেখানে একের পর এক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে বেজিং। এবার ওই এলাকায় পৌঁছনো যাবে চীনের জাতীয় সড়ক ধরেই। পার্বত্য এলাকাতেই সম্প্রসারিত হবে হাইওয়েটি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্যাটেলাইট ছবিটি গত বছরের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে তোলা। যেখানে দেখা যাচ্ছে, সিয়াচেন হিমবাহের কাছে অধিকৃত কাশ্মীরের একটি অংশে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করছে চীন। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা একে ভারতের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন হিসেবে দেখছেন। গত কয়েক বছর ধরেই পূর্ব লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) এমনকী, ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্দরে নির্মাণের কাজ চালানো, গ্রাম তৈরির অভিযোগ উঠেছে চীনা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। এবার তার নজির মিলল সিয়াচেনেও। এর আগে অরুণাচল প্রদেশে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া বেশ কিছু এলাকায় চীনের পরিকাঠামো নির্মাণের খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। তারওপরে অরুণাচলের কিছু এলাকার নামও বদলে নিজেদের মতো করে অন্য নাম রেখেছিল বেজিং। যদিও তাতে পাত্তা দেয়নি নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে এবার সিয়াচেনের কাছে চীনের তৎপরতায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এতে করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দ্রুত সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণে উদ্দেশ্যেই শাক্সগাম থেকে সিপিইসি সংযোগকারী রাস্তা বানাচ্ছে চীনা সেনাবাহিনী। যা ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক।

কেন সিয়াচেনের গা ঘেঁষে হাইওয়ে বানাচ্ছে চীন? বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ইউরেনিয়াম-সহ নানা খনিজ পদার্থ পাকিস্তান থেকে চীনে পৌঁছনোর জন্যই এই সড়ক তৈরি হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই সড়ক ধরে যাতায়াত করবে পাকিস্তান-চীনের সেনাও। এবং তার জেরেই বিঘ্নিত হবে ভারতের নিরাপত্তা।

কয়েক বছর আগে প্যাংগং হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ তীর জুড়ে চীনা সেনার সেতু নির্মাণের তৎপরতা ধরা পড়েছিল উপগ্রহচিত্রে। এর পরে ম্যাক্সার প্রকাশিত উপগ্রহচিত্র দেখিয়েছিল, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া আকসাই চীন এলাকায় চীনাসেনা স্থায়ী বাঙ্কার এবং বড়ো সুড়ঙ্গ তৈরি করছে। ভবিষ্যতে সংঘাতের পরিস্থিতির মোকাবিলার লক্ষ্যে শি জিনপিঙের সেনার এই পদক্ষেপ বলে ভারতের ধারণা। ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে সেনার পাশাপাশি ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ রসদ মজুত রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে বলেই ২০২৩-এর জুলাই-আগস্টে তোলা উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে মনে করছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ঘটনাচক্রে, সিয়াচেনের উপগ্রহচিত্রগুলিও ওই একই সময়ে তোলা।

পশ্চিম চীনের শিনজিয়াং প্রদেশের কাশগড় থেকে দক্ষিণ পাকিস্তানের গদর বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত কারাকোরাম হাইওয়ে (যার পোশাকি নাম হলো চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর বা সিপিইসি) গিয়েছে শাকসগাম উপত্যকার অদূর দিয়েই। তেরোশো কিলোমিটার দীর্ঘ এই 'বাই লেন' মহাসড়ক চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অস্ত্র। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দ্রুত সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণে উদ্দেশ্যেই শাক্সগাম থেকে সিপিইসি সংযোগকারী রাস্তা বানাচ্ছে চীনা সেনাবাহিনী। যা ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। □

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে জয়যুক্ত করার আহ্বান বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৮ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে আয়োজিত হয় মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠান। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং কলকাতা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাসভার আধিকারিক ও সমাজসেবী সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, হিংলাজ চট্টোপাধ্যায় এবং অফিস সেক্রেটারি অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ীর মতো শতবর্ষ পেরোনো সংগঠন হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা ও বরেণ্য হিন্দু নেতৃত্বকে স্মরণ করে মহাসভার বর্তমান পদাধিকারিরা এই বছরে দেশ জুড়ে সংঘটিত লোকসভা নির্বাচনে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে নীতিগত সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। প্রতিটি ভারতবাসীকে তাঁরা এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিজেপি ও এনডিএ-র প্রার্থীদের ভোটদানের আবেদন জানান। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর, ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, পরিচালিত বিজেপি দল ও এনডিএ সরকার হিন্দু মহাসভার অনেক নীতির সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছে— এই মত উঠে আসে তাঁদের বক্তব্যে। মনীষীদের স্মৃতিধন্য পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দুর্বিষহ পরিস্থিতি তুলে ধরে বিজেপিকে সমর্থনদানের মাধ্যমে এই রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূচনার ওপরেও তাঁরা জোর দেন।

কিছু নীতিহীন, স্বঘোষিত নেতা-নেত্রী বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে হিন্দু মহাসভার নাম ব্যবহার করে অনবরত অনৈতিক কাজ করে চলেছে। তাদের সঙ্গে মহাসভার কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়ে এই স্বঘোষিত নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে মহাসভার নেতৃত্ব তীব্র প্রতিবাদ জানান।

হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৭ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর, কামনগর, মনিকাহার-সহ অন্যান্য স্থানে রামনবমীর শোভাযাত্রা এবং চড়ক ভক্তদের ওপর বোমা ও পাথর বর্ষণের

মাধ্যমে জেহাদিদের নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদে গত ২৬ এপ্রিল, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল আয়োজিত হয়। মিছিলের শেষে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্ট বক্তারা মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের ওপর কীভাবে জেহাদি অত্যাচার চলছে তার বিবরণ দেন। রামনবমীর দিন হিন্দুদের ওপর জেহাদিদের আক্রমণের বর্ণনা করার সময় তাঁরা জানান যে অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। অনেকের বাড়ি লুটপাট করা হয়েছে। দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্য প্রমাণ-সহ সেদিনের জেহাদি আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ ডেপুটেশনের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া হয়।